বি আই ডি এস ওয়ার্কিং পেপার

BIDS WORKING PAPER

BAN
BIDS
Wp-3
1987
C-02

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান
ঢাকা, বাংলাদেশ
BANGLADESH INSTITUTE OF DEVELOPMENT STUDIES
DHAKA, BANGLADESH

BAN/BIDS/
WP. 3

68

B.I.D.S. LIBRARY
DHAKA
Acc. No. ...
Date ... /১০/৮৭

ওয়ার্কিং পেপার নং – ৩

গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক অবস্থাঃ সম্পদ মালিকানা কাঠামো, শিক্ষা ও কর্মসংস্থান সমস্যা

নারায়ণ চন্দ্র নাথ

সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭

BIDS Library
E-17, Agargaon, Dhaka
Acc.# 86938
Date:
MFN#

BIDS_LDC
086938

মূল্যঃ দশ টাকা

লেখক – বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বি, আই, ডি, এস) একজন গবেষণা ফেলো।
ই-১৭, আগারগাঁও, শেরে-ই-বাংলানগর, ঢাকা-৭, বাংলাদেশ।

সূচীপত্র

			পৃষ্ঠা নং
১।	ভূমিকা	...	১
২।	অর্থনৈতিক প্রিম্যাকর্মের ধরন ও ভূমি সম্পদ মালিকানা কাঠামো	...	৩
	পেশার সাথে আয়ের সম্পর্ক	...	৬
	গবাদি পশুপালন	...	১৩
	মৎস্য চাষ	...	১৭
৩।	অভূমি সম্পত্তির মালিকানা	...	১৮
৪।	ঋণের উৎস ও ব্যবহার	...	২০
৫।	শিক্ষার অবস্থা	...	২৩
৬।	আয় ও জীবন যাত্রার মান এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কাঠামো	...	২৯
৭।	সার সংক্ষেপ ও উপসংহার	...	৩৪
৮।	টীকা	...	৪০

সারণী

ক্রমিক নং	শিরোনাম		পৃষ্ঠা নং
১।	জমির মালিকানা ও পেশাগত বন্টন সম্পর্ক	...	৭
২।	পেশাগত ধরনের সাথে আয়ের সম্পর্ক (হারিয়াগ্রাম)	...	৯
৩।	প্রধান পেশার সাথে উপপেশার যোগসূত্র (হারিয়া গ্রামের তথ্যের ভিত্তিতে)	...	১১
৪।	অভূমি সম্পত্তির মালিকানা ও পেশাগত বন্টন (% হারিয়া গ্রাম)	...	১৯
৫।	পেশা অনুযায়ী ঋণ উৎস ও ব্যবহার (হারিয়া গ্রাম ১৯৭৯)	...	২১
৬।	শিক্ষার মান ও জমির মালিকানা সম্পর্ক (হারিয়া গ্রাম)	...	২৫
৭।	শিক্ষামান ও আয়	...	২৬
৮।	নিরক্ষর পরিবার গুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট	...	২৭
৯।	কর্মে নিয়োগের হার, পরিবারের আকার, মাথাপিছু জমি ও অন্যান্য সম্পত্তির মালিকানা এবং পরিবারের শিক্ষার সাথে আয় মানের সম্পর্ক (হারিয়া গ্রাম)		
	লেখ চিত্র - ১	...	৩১(ক)

১। ভূমিকাঃ

বাংলাদেশের জনসংখ্যার শতকরা ৮৬ ভাগ লোক গ্রামে বসবাস করে এবং শতকরা ৮৪ ভাগ শ্রমশক্তি বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মে গ্রামে নিয়োজিত বিধায় জাতীয় উন্নয়নে গ্রামীণ অর্থনীতির রূপান্তর[১] ও গ্রামের উন্নতির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আর গ্রাম উন্নয়নের সুনির্দিষ্ট রূপরেখা তৈরী ও পরিকল্পনার লক্ষ্যে সর্ব প্রথম যা প্রয়োজন, তা'হল গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে যথাযথ বিশ্লেষণ। এর উপর কিছু গবেষণা কাজ[২] হলেও প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিক্ষার উন্নতি এবং আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন কল্পে কোন কর্মসূচী হাতে নিতে গেলে যে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, তাকে উপজীব্য করেই ১৯৮০ সনে ঢাকার সোনার গাঁও এলাকায় সাতটি গ্রামের উপর একটি জরীপ[৩] কাজ চালানো হয়েছিল এবং তারই তথ্য বিশ্লেষণ পূর্বক এ প্রতিবেদন। এ সমীক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হল ঃ গ্রামের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণ করত মূল সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণ এবং বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক দিক বিশ্লেষণ। ইহা ছাড়া ভবিষ্যতের গ্রাম উন্নয়নের উপর পরীক্ষা নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা।। প্রতিবেদনে সম্পদের মালিকানা কাঠামোর সাথে সম্পর্কযুক্ত করে কর্মসংস্থান ও শিক্ষার অবস্থা দেখানোর প্রচেষ্টা রয়েছে। এছাড়া ঋণ এবং জীবনযাত্রা মানের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হয়েছে। মূল প্রবন্ধটি ৭টি ভাগে বিভক্ত। প্রথম অনুচ্ছেদে ভূমিকা, ২য় অনুচ্ছেদে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মের ধরণ ও ভূমি মালিকানা কাঠামো, ৩য় অনুচ্ছেদে অভূমি সম্পদ মালিকানা, ৪র্থ অনুচ্ছেদে ঋণের উৎস ও ব্যবহার, ৫ম অনুচ্ছেদে শিক্ষার অবস্থা এবং ৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদে আয় ও জীবনযাত্রার মান এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়া ৭ম অনুচ্ছেদে সারাংশ ও উপসংহার স্থান পেয়েছে।

জরীপে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্ন মালা ছক পুরনের সাথে সাথে আলোচনা, পরোক্ষ জিজ্ঞাসাবাদ ও পর্যবেক্ষন পদ্ধতিও অনুসৃত হয়েছে। লেখক নিজেই গ্রামে দীর্ঘকাল থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। তথ্য সংগ্রহে গবেষণা সহকারী ছাড়াও স্থানীয় ছাত্র ও যুবক বৃন্দ ব্যাপৃত ছিলেন। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, বিভিন্ন প্রশ্ন, আলোচনা, পর্যবেক্ষণ করে ও সঠিক তথ্য বের করা অনেক সময় কঠিন হয়ে উঠে। তবে গ্রামের লোকদের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে

বসবাস করতে পারলে সঠিক তথ্যের কাছাকাছি পৌঁছানো যায়। তবে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, গ্রামের লোকজন যদি গবেষণা কাজের সাথে তাঁদের স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ার ভয় না দেখে, তাহলে গবেষণা কাজে গ্রামের জনগণকে অধিকতর ব্যবহার করা যাবে। গবেষণা কাজের প্রতি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। বিত্তবানদের তথ্য চাপিয়ে রাখার এবং বিত্তহীনদের খোলাখুলি সব উজাড় করে বলে দেয়ার প্রবণতা স্বাভাবিক মনে হয়েছে। সঠিক তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারেও গবেষণা কাজে ছাত্র-শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দের এবং গ্রামের কর্মকান্ড সম্বন্ধে অভিজ্ঞ লোকদের যথাযথ ব্যবহারের উপায় উদ্ভাবনের প্রয়োজন রয়েছে। এ প্রতিবেদনে আর্থ-সামাজিক অবস্থা চিত্রনে সারণী ভিত্তিক কার্যকরণ সম্পর্কের বিশ্লেষণ প্রাধান্য পেয়েছে।

ঢাকা জেলার সোনারগাঁও উপজিলার ১১টি ইউনিয়নের মধ্যে বৈদ্যের বাজার ইউনিয়নের ২৩টি গ্রামের এ সাতটি গ্রাম পাশাপাশি অবস্থান করছে। মেঘনা নদী বিধৌত পলিমাটিতে জমিগুলো খুব উর্বর এবং রবিশস্য উৎপাদনের জন্য ভারী উপযোগী। সমীক্ষিত গ্রামগুলোর কোন কোন গ্রামের অংশ বিশেষ মেঘনা নদীর গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। ঢাকার সাথে সরাসরি যোগাযোগ জনিত পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত মনে হলেও গ্রামগুলোর ভেতরকার যাতায়াত ব্যবস্থা অনুন্নত। গ্রামগুলোতে গ্রীষ্ম ও শীতকালে হেঁটে যেতে হয় আঁকা-বাঁকা মেঠো অথবা আইলের পথ ধরে। বর্ষায় নৌকা ছাড়া বিকল্প পরিবহন উপায় নেই। তবে ইদানিং একটি বড় রাস্তা তৈরীর কাজ এগিয়ে যাচ্ছে " খাদ্যের বদলে কাজ" - এ কর্মসূচীর আওতায় এবং 'কেয়ার' -এর তত্ত্বাবধানে। গ্রামগুলো ইউনিয়নের অন্যান্য গ্রামের তুলনায় উপজিলা অফিস কেন্দ্র এবং বৈদ্যের বাজার ও লঞ্চ ঘাটের অপেক্ষাকৃত নিকটে।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে এ এলাকা বাংলাদেশের এক গৌরবময় ও সম্পদশালী জনপদের অবক্ষয়ের আর ধ্বংসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত উন্নত কারুকার্য সম্বলিত পুরোনো দালানকোঠা, দীঘি, লিচু-আম ও অন্যান্য ফলফলাদির বাগান এখানে গ্রামগুলোর ঐতিহ্যবাহী অতীতের স্মৃতি বহন করছে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির অব্যবহিত পর এবং ১৯৬৪ সালে এ এলাকায় সাম্প্রদায়িক দাংগাহাংগামা ও লুটতরাজে বিষয় সম্পত্তি ও জনপদের ভীষণ ক্ষতি সাধিত হয়। দাংগাহাংগামার কবলে পড়ে জনগোষ্ঠীর একটি বৃহদাংশ বিষয়সম্পত্তি ফেলে দেশের অন্য জায়গায় অথবা দেশ ছেড়ে

চলে যেতে বাধ্য হয়। ফলে, একদিকে যেমন বিক্ষিপ্ত বসতি ও ঘরবাড়ী, অপরদিকে প্রচুর পরিত্যক্ত সম্পত্তি পরিলক্ষিত হয়। এগুলো নিয়ে মামলা মোকদ্দমা ও রেষারেষি চলছে এখনও। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, একটা নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় স্থানীয় মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক লোকের হাতে পরিত্যক্ত সম্পত্তিগুলো চলে গেছে এবং মেঘনা নদীর ভাংগনে ও অন্যান্য আর্থ-সামাজিক কারণে সৃষ্ট ভূমিহীন, বিত্তহীন ও স্বল্প বিত্তের দল আপামর জনসাধারণ এ মুষ্টিমেয় কিছু লোকের স্বেচ্ছাচারী নিয়ন্ত্রনের (অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক) জীবনযাপনে বাধ্য হয়েছে। রাজনৈতিক ও গ্রাম্য দলাদলিতে বিত্তবানদের কেন্দ্র করে এখানে সমাজ ও গোষ্ঠী বোধ ক্রিয়া করছে। স্থানীয় নেতৃত্বে, সমবায় সমিতি সংগঠনে, সরকারী বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে, ঋণপ্রাপ্তিতে, সরকার কর্তৃক প্রদত্ত উৎপাদনের উপকরণ বন্টনে তারাই মূখ্য ভূমিকা পালন করে।

২। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মের ধরন ও ভূমি সম্পদ মালিকানা কাঠামোঃ

গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণে সর্বপ্রথমে যে বিষয়টি মূখ্য, সেটি হল জনসম্পদের কাঠামো এবং পেশাগত বন্টন। সাতটি গ্রামের[৩] মোট পরিবার সংখ্যা ৬১৩। অধিকাংশ গ্রাম ছোট এবং বড় গ্রামের সাথে ছোট ছোট গ্রাম ও একত্রে অবস্থান করছে। গড়ে পরিবার প্রতি লোকসংখ্যা ৬·৬। পুরুষ ও মহিলার অনুপাত ১·১৮ঃ১। ১৫ থেকে ৭৫ বছর বয়সের লোকসংখ্যা ১১৯৫। ১১৫০ জন লোককে কর্মক্ষম হিসেবে ধরা যায়। এদের মধ্যে ১০৭৭ জন অর্থাৎ ৫৫% কর্মক্ষম লোক প্রকৃত পক্ষে অর্থ উপার্জনকারী কর্মে নিয়োজিত।

১০ বছর ন্যূনতম কর্মক্ষমতার বয়সের ভিত্তিতে ৫৮·৩% কর্মক্ষম লোকের মধ্যে ২৬·৮% লোক[৪] অর্থ উপার্জনকারী কাজে নিয়োজিত রয়েছে। এর অর্থ এ যে, অর্থকরী কাজে ৪৬% কর্মক্ষম লোক নিয়োজিত এবং বাকী ৫৪% লোক বেকারত্ব এবং অর্ধবেকারত্বের সমস্যায় জর্জরিত। জাতীয় পর্যায়ে ৫৯·৫% লোক কর্মক্ষম। এদের মধ্যে ৪১% লোক উপার্জনকারী কর্মে নিয়োজিত। অর্থাৎ সমীক্ষিত গ্রামগুলোতে বেকারত্ব ও অর্ধবেকারত্বের হার জাতীয় পর্যায় থেকে বেশী। মহিলা শ্রমশক্তি সামাজিক প্রতিবন্ধকতার মুখে উপার্জনকারী কোন কাজে অংশ গ্রহণের সুযোগ পায় না, যদিও আর্থিক চাপে কেউ কেউ ঝি'র কাজ অথবা ধানের কলে সিদ্ধ ও শুকানোর কাজে হাড়ভাংগা খাটুনি খাটে। তবে পুরুষ শ্রমিকের অর্ধেকেরও কম পারিশ্রমিক তাদের ভাগ্যে জোটে।

নদীর ভাংগনে, পেশা পরিবর্তনের ফলেও অন্যান্য সামাজিক কারণে একান্নবর্তী পরিবারগুলো যাচ্ছেতাই। ২·৮% হারে জনসংখ্যা বাড়লেও পরিবারের সদস্য সংখ্যা বাড়েনি। পেশার ধরনের সাথে ও এর একটি সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়। পেশাগতভাবে ৭টি গ্রামের ১০৭ জন কর্মজীবি মানুষের ৩২% কৃষিতে, ৩১% ব্যবসায়, ১২·৭%, মজুরীতে, ১১·৭% মাছধরায় ও ৩% শিল্পে নিয়োজিত। অকৃষিকাজে প্রায় ৪৩% লোক কাজ করে। এটা জাতীয় পর্যায়ে গ্রামীণ সংখ্যা থেকে বেশী। যে সব গ্রামে ভূমিখনই অধিক সংখ্যক সে সব গ্রামগুলোতে মাছ ধরা অথবা ব্যবসা প্রধান উপজীবিকা হিসেবে প্রাধান্য লাভ করেছে। ব্যবসার মধ্যে ক্ষুদে ব্যবসায়ীর সংখ্যাই বেশী। তারা সাধারণতঃ কাঁচামালের ব্যবসা, পানসুপারী সিগারেট বিড়ি, বিস্কুট, ছোট-খাটো হোটেল, চাউল, বিভিন্ন ফল-ফলাদি ও কাঁচামালের ব্যবসায় নিয়োজিত। মূলী বাঁশের ব্যবসা, মাছের আড়তদারী, চাউলের কল রয়েছে বিত্তশালীদের হাতে। এগুলো সবচেয়ে বেশী লাভজনক পুঁজি বিনিয়োগের খাত।

প্রধান উপজীবিকা কৃষির ভিত্তি হল জমি। পর্যবেক্ষন করলে দেখা যাবে যে, কৃষির উন্নতির সাথে সরাসরিভাবে জড়িত রয়েছে জমির মালিকানা কাঠামো, জমির গুণগত মান, সময়মত প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ সরবরাহ ও কৃষি দ্রব্যের বাজারজাতকরণ এবং ঋণ সরবরাহের ব্যবস্থা। অধিকাংশ জমি (প্রায় ৭৫%) কৃষি কাজেই ব্যবহৃত হয় এবং কৃষি জমির মালিকানা কাঠামো অর্থনৈতিক উন্নতির উপর প্রভাব বিস্তার করছে। জমি মালিকানায় অসম বন্টন কতটুকু ব্যাপক, সাতটি গ্রামের কৃষি জমির মালিকানা কাঠামোর চিত্রে সুস্পষ্ট।

গ্রামগুলোর শতকরা ৫৮·২৩ ভাগ পরিবার ভূমিহীন। অনেক গ্রাম রয়েছে যেখানে ভূমিহীনের সংখ্যা ৮০% পরিবারের ও অধিক। ৯% পরিবারের নিজস্ব কোন বসতবাড়ীই নেই। যাদের জমির স্বত্বাধিকার রয়েছে তাদের মধ্যে শতকরা ৬৮·৭৫% ভাগ পরিবার মাত্র ১ একর পর্যন্ত জমির মালিক এবং মোট জমির শতকরা ২৬ ভাগের অধিকারী। ২ একরের উর্ধে জমির মালিকের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য (শতকরা ৬ ভাগ পরিবার) অথচ অধিকাংশ জমি (প্রায় ৫৪% জমি) তাদের। জমি মালিকানায় অসমতাও কেন্দ্রীকতার ছাপ সুস্পষ্ট, এবং কেন্দ্রীভূতকরণসহ ৪·৬৮ যেখানে জাতীয় পর্যায়ে ১৯৭৮ সালে জমি মালিকানার গিনিসহগ ·৬৬। জমি মালিকানার সাথে পেশা বন্টনের ধরনের একটা নিবিড় সম্পর্ক থাকার কথা।

সারণী - ১ থেকে সহজে অনুধাবন করা যায় যে, উপার্জনকারী লোক সংখ্যার অর্ধেকেরও বেশী ভূমিহীন পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। আবার ৩৫৭টি এ ভূমিহীন পরিবারগুলোর ৫৭৪ জন উপার্জনকারী সদস্যের মধ্যে মাত্র ১৩% সদস্য বর্গায় বা পত্তনে জমি চাষ করে। ২০% ভূমিহীন জাতিগত পেশা মাছ ধরায় নিয়োজিত, ১৭% ভূমিহীন দিন মজুরীতে রয়েছে। অর্থাৎ অর্ধেকেরও বেশী ভূমিহীন কৃষি বর্হির্ভূত কাজ করছে। ভূমিহীনদের অধিকাংশ নুদে ব্যবসায় (৩৫%) নিয়োজিত এবং অল্প পুঁজির মালিক। সবচেয়ে লক্ষ্যনীয় বিষয় এই যে, জমির আয়তন বাড়ার সাথে সাথে কৃষিতে নিয়োগ বেড়ে যায় এবং নির্দিষ্ট আকার পর্যন্ত পৌঁছার পর আবার অকৃষি খাতে নিয়োগের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। যেমন ০·৩৩ একরের নীচে জমির মালিকানায় ৩৪% কৃষিতে নিয়োজিত এবং জমি মালিকানা বৃদ্ধির সাথে সাথে ২·০১-৩·০০ একর আয়তনে এ আকার ৮৪·৪%তে পৌঁছে। তারপর জমির আয়তন বৃদ্ধির সাথে সাথে ইহা ৩·০১-৪০০ একর আয়তনে ৫৪% থেকে হ্রাস পেয়ে যথাক্রমে ৪·০১-৫·০০ একরে ৩০·৭৪% এবং ৫+ একরে ২৫%তে নেমে যায়। এর কারণ এ যে, নুদে কৃষকদের পারিবারিক শ্রম উদ্বৃত্ত কাজে লাগানোর জন্য জমি যত বেশী থাকবে ততই বেশী তারা কৃষি কাজে নিয়োজিত থাকবে। জমি মালিকানার আয়তন নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করলে চাষাবাদ করতে মজুর শ্রম সাহায্যের প্রয়োজন হয়। মজুরের পারিশ্রমিক দেয়ার পর সব সময় বিশেষ করে প্রাকৃতিক অনিয়মের সময় চাষাবাদে লাভবান হওয়া যায় না। তাই বড় জমির মালিকরা পত্তনে জমি দিয়েও সে টাকা ব্যবসায় বিনিয়োগ করে বেশী লাভ ভোগ করার সুযোগ পায়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, জমির আয়তন বাড়ার সাথে সাথে মূলী বাঁশের ব্যবসার ভাগও বেড়ে যায় এবং অন্যান্য নুদে ব্যবসার ভাগ একেবারেই কমে যায়। বৃহৎ জমির মালিকদের ৫ একরের উর্ধ্বে জমির মালিকদের ১৬৮·৭৫% জনকে বেশী পুঁজির ও অধিক লাভজনক ব্যবসায় (মূলী বাঁশের) নিয়োজিত হতে দেখা যায়। এ ধরনের প্রবণতা গ্রামীণ শিল্প সমীক্ষা প্রকল্পের আওতাধীন দেশের ১১টি গ্রামের জরিপেও দেখা গেছে।

মজুরী শ্রমের আধিক্য ভূমিহীন এবং অল্প জমির মালিকদের মধ্যে (১২%)। জেলেদের মধ্যে ১৪·৪৪% ভূমিহীন। যারা পরিবহন কর্মে নিয়োজিত আছেন তাদের কারোরই ·৫০ একরের উর্ধ্বে জমি নেই। শিল্প কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের প্রায় ৮৫% ভূমিহীন। শ্রমমজুরী, শিল্প, মাছধরা, নুদে ব্যবসা

সারণী – ১

জমির মালিকানা ও পেশাগত বন্টন সম্পর্ক (%)

পেশা / জমির একরে	কৃষি	ব্যবসা: মুদিখানা	ব্যবসা: মাছ	ব্যবসা: অন্যান্য	চাকুরী	মজুরী	শিল্প	মাছধরা	পরিবহন কর্ম	অন্যান্য	মোট শতকরা হার
0	২১.৪৩ (১৩.০৭)	৩৭.২৯ (৫.৫৭)	৬২.৯০ (৬.৬৯)	৬৭.২০ (২২.১৩)	৬০.৯৪ (৬.৬৯)	৭০.৮০ (১৬.৯০)	৮৪.৮৫ (৪.৮৮)	৯৪.৪৪ (২০.৭৩)	৩৪.২৮ (১.৫৭)	৪৪.৪৪ ১.৩৯	৫৩.৩০ (১০০)
০.৩৩	১৬ (৩৪.১৫)	১৯.০৫ (৯.৭৬)	৩.২৩ (১.২২)	১৮.৫২ (২১.৩৪)	১৭.২ (৬.৭)	২২.৬৩ (১৮.৯)	৩.০০ (.৬১)	১.৫৯ (১.২২)	২১.৪৩ (১.৮৩)	৩৮.৮৯ (৪.২৭)	১৫.২২ (১০০)
.৩৪ – ৫০	১০.৮৬ (৬২.২৯)	৩.৫৭ (৪.৯২)	৩.২৩ (৩.২৮)	৩.১৭ (৯.৮৩)	৪.০৯ (৪.৯২)	১.৪৬ (৩.২৮)	৬.০৬ (৩.২৮)	0 (৩.২৮)	১৪.২৯ (৪.৯২)	১৫.৫৭ (৪.৯২)	৫.৫৬ (১০০)
.৫১ –১.০০	২১.৭২ (৭১.৭)	৪.৭৬ (৩.৭৭)	৯.৬৯ (৫.৬৬)	৫.৮২ (১০.৩৮)	৪.৬৯ (২.৮৩)	২.৯২ (৩.৭৭)	0	১.৫৯ (১.৮৯)	0	0	৯.৮৪ (১০০)
১.০০–২.০০	১৩.১৪ (৬২.১৬)	২.৩৮ (২.৭০)	১৭.৭৪ (১৪.৮৬)	৩.৭০ (৯.৪৬)	৬.২৫ (৫.৪২)	২.১৯ (৪.০৫)	0	০.৭৯ (১.৩৫)	0	0	৬.৮৭ (১০০)
২.০১–৩.০০	১০.৮৬ (৮৪.৪৪)	–	–	১.৫৯ (৬.৬৮)	–	–	৬.০৬ (৪.৪৪)	১.৫৯ (৪.৪৪)	0	–	৪.১৮ (১০০)
৩.০১–৪.০০	৩.৭১ (৫৪.১৬)	১১.৯০ (৪১.৬৭)	0	0	১.৫৬ (৪.১৭)	0	0	0	0	0	২.২৩ (১০০)
৪.০১–৫.০০	১.৬ (৩৩.৭৪)	২৩ (৬০)	৩.১ (৯.৩৬)	0	0	0	0	0	0	0	১.৭ (১০০)
৫.০০ +	.৭ (২৫)	৮.০৫ (৬৮.৭৫)	0	0	৪.৬৭ (৬.২৫)	0	0	0	0	0	১.০০ (১০০)

বিঃদ্রঃ বন্ধনীর মধ্যে শতকরা সারিতে (   ) এবং বন্ধনীর বাইরে স্তম্ভাকারে (   ) শতকরা হার সাজানো হয়েছে।

ভূমিহীনদের অধিকাংশই অকৃষি ক্রিয়াকর্মে নিয়োজিত থাকার প্রধান কারণ ভূমির স্বল্পতা, ভূমিহীনের আধিক্য এবং এলাকায় বিরাজমান পত্তনিতে জমি নিয়ে পুঁজির অভাবে কৃষি কাজ করার অসুবিধে। ভূমিহীনদের প্রধান পেশা ক্ষুদে ব্যবসার আয় খুবই অল্প, তবে পুঁজি কম প্রয়োজন, তাই এরা নিয়োজিত থাকতে পারে। ঢাকার সাথে ভাল যাতায়াতের সুবিধে এবং নৈকট্য রয়েছে বলে ছোট-খাট ব্যবসায় নিয়োজিত থেকে কিছু উপার্জন করার সুযোগ হয়েছে। এদের মধ্যে সময়ের মাপকাঠিতে বেকার বসে থাকা লোকের সংখ্যা কম। এদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত শ্রম ও স্বল্প আয় পাশাপাশি অবস্থান করে। তবে একই সাথে এটিও সত্য যে, এদের অধিকাংশই বিপুল সংখ্যক নির্ভরশীল সদস্য নিয়ে দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করছে এবং পরিবারের উদ্বৃত্ত শ্রম ব্যবহারের সুযোগ খুঁজে পাচ্ছে না। হিসেবে করে দেখা গেছে, এদের মধ্যে ৭৮% লোক নিম্ন আয়ের গ্রুপে অবস্থান করছে। তবে যারা দিন মজুরীতে রয়েছে তারা সর্ব নিম্ন আয়ের গ্রুপে রয়েছে। তাদের জমিও নেই, পুঁজিও নেই, আছে শুধু উপার্জনের জন্য গতরখানি।

পেশার সাথে আয়ের সম্পর্ক ঃ

পেশার ধরনের সাথে আয়ের কি সম্পর্ক রয়েছে তা হারিয়া গ্রামের উপর তথ্যের ভিত্তিতে আলোচনা করা যেতে পারে (২নং সারণী) ।

সারণী – ২ থেকে লক্ষ্যনীয় যে, নিম্নতম আয়ের লোকদের প্রধান উপজীবিকা কৃষি এবং দিনমজুরী যা একত্রে ৭৮% । আয় বাড়ার সাথে সাথে উপজীবিকা **হিসেবে** ব্যবসার আধিক্য ঘটে। যেমন 'ঙ' আয়ের গ্রুপে ব্যবসায় নিয়োজিত ৫৩% কর্মক্ষম সদস্য। নিম্নবিত্ত এবং মধ্যবিত্তদের ক্ষুদে ব্যবসার প্রাধান্যই বেশী। দিনমজুরী যারা করে তাদের ৯০% নিম্ন আয়ের এবং আবার আয় বাড়ার সাথে দিনমজুরী পেশা **হিসেবে** বেশী একটা পরিলক্ষিত হয়না। ব্যবসায়ে আয় বাড়ার সাথে সাথে ঘুনীবাঁশ এবং মাছের আড়তদারীর মত সর্বাধিক লাভজনক অথচ পুঁজিবহুল ব্যবসায় অংশ বেড়ে যায় এবং ক্ষুদে ব্যবসার অংশ কমে। শিল্পে নিয়োজিতদের মধ্যে ৭১% সদস্য নিম্ন আয়ের পরিবারের। মাছ ধরায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের মধ্যেও অধিকাংশ নিম্ন আয়ের (৮০%)

এবং অবশিষ্ট ২০% মধ্যবিত্ত পর্যায়ের। উচ্চ-মধ্যবিত্ত এবং উচ্চ বিত্তদের গ্রুপে জেলেদের কেউই পড়েনি। কৃষি কাজে নিয়োজিতদের মধ্যে মাত্র ১১·৮% সদস্য উচ্চবিত্তের পর্যায়ে পড়ে। অতএব কৃষি, শিল্প, মাছধরা, দিনমজুরী এ সমস্ত পেশা নিম্ন আয়ভুক্তলোকদের পর্যায়ে সীমাবদ্ধ। অপর-দিকে ব্যবসা বিশেষ করে মুলীবাঁশের ব্যবসাও মাছের আড়তদারী মধ্যবিত্ত এবং উচ্চ বিত্তদের মধ্যেপ্রসার লাভ করেছে। এটার কারণ এযে, এসব ব্যবসায় যথেষ্ট পুঁজির প্রয়োজন রয়েছে, যা স্বল্প আয়ের পরিবারের যোগান সম্ভব হয়ে উঠে না। আয়কে পেশা ধরনের ফল হিসেবেও ধরা উচিত। যেমন, কৃষি থেকে ব্যবসাতে নিয়োগ আয়ের উপর বেশী ফলপ্রসূ প্রভাব বিস্তার করে। দিনমজুরী, শিল্প এবং মাছধরার মত গতরখাটা কষ্টের কাজে আয় বেশী হয় না। এগুলো বৃহত্তর সামাজিক আংশিকে দেখলে হতাশার চিত্র ফুটে ওঠে এবং অনুৎপাদনমূলক কাজের প্রতি দৃষ্টি জনিত কুফলে সামাজিক সমস্যা বৃদ্ধি পাওয়ার আশংকা মূর্তমান হয়ে ওঠে।।

কৃষি এবং অকৃষি খাতে কর্মসংস্থানের বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন সামাজিক কারণে বিশেষ করে বৃহত্তর শ্রমজীবি মানুষ উৎপাদনের উপকরণ, প্রাকৃতিক ও বৈষয়িক সম্পদের অংশথেকে বিপুলভাবে বঞ্চিত থেকে অর্ধবেকারত্ব ও দারিদ্র্যের মধ্যে দিন যাপন করছে। দরিদ্র পরিবারগুলোর পুঁজি না থাকলেও সম্পদের অনুপাতে প্রচুর উদ্বৃত্ত শ্রম রয়েছে, যার যথাযথ ব্যবহারের জন্য সম্পদের সুষ্ঠু বন্টন একান্ত প্রয়োজনীয়। ইহা নিশ্চয়ই বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাথে জড়িত।

এখানে ভূস্বামীরা অগ্রিম টাকার বদলে জমি পত্তন দেয় এবং সে টাকা দিয়ে ব্যবসা করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করে। এ ভূস্বামীরা মজুর শ্রম দিয়েও চাষাবাদ করতে পারত। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, ব্যবসাতে টাকা বিনিয়োগ করলে যে লাভ হয় কৃষিতে তা অতি নগণ্য। বৃহত্তর জনগোষ্ঠি যাদের পুঁজি নেই অথচ নিজের শ্রম ক্ষমতা এবং প্রচুর পারিবারিক উদ্বৃত্ত শ্রম (লেবার সারপ্লাস) রয়েছে তারা কৃষি পেশাতে রয়েছে। আর যাদের পুঁজি আছে তারা ব্যবসায় থেকে লব্ধ মুনাফায় উত্তরোত্তর ধনবান হচ্ছে এবং ক্ষমতা কাঠামোতে অধিকতর নিয়ন্ত্রন সুবিধে ভোগ করছে। বিভিন্ন সমবায় সমিতি থেকে ঋণ প্রাপ্তিসহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা এ ব্যবসায়ীরাই ভোগ করছে।

সারণী — ২

পেশাগত ধরনের সাথে আয়ের সম্পর্ক (হারিয়া গ্রাম)

...জীবি ...খ্যা	পেশাগত বন্টন - শতকরা ভাগে									
	কৃষি	মজুরী	ব্যবসা			শিল্প	চাকুরী	মাছধরা	পরিবহন কাজ	অন্যান্য
			মুদী বাঁশ	গাছ	অন্যান্য					
...১	১৯.৮ (৩৬)	৪৯ (৪২)	৪ (৩)		৬.৯ (৫)	–	৭.৯ (৩)	৬.৭ (১)	২০ (৩)	৫৮.৪ (৭)
	৪৭.৭৪ (৪০.৫)	৪৩ (১২.৮৫)	৪৮.৭৫ (১৪.৫)	২৩.৫ (৯.৫)	৩৭.৫ (১০.৬)	৭০.৫ (৪.৮)	৩৯.৪৫ (৭)	৭০.৩ (৪.৪)	৪৬.৬ (২.৮)	৩৩.৩ (১.৬)
...৮	১৭ (৪১.২)	৪.০ (২.৩)	১৩.৫০ (১১.৪)	৩৫.৩ (৭)	৩০.৬ (২৫)	১১.৮ (২.৪)	১৩.২৬ (৬.০)	২০ (৩.৫)	–	৮.৩ (১.২)
	৩.৭ (১৯)	৪ (৭.৫)	৮.১ (১৪.৩)	৫.৯ (২.৪)	৯.৭ (১৬.৭)	৭.৭ (৭.১)	২৬.৩ (২৩.৫)	–	২৬.৭৭ (৯.৫)	–
	১১.৮ (৩৯)	০	২৫.৭ (২৭)	৩৫.৩ (৯)	১৫.৩ (১৭)	–	১৩.১ (৭)	–	৬.৭ (১)	–
	১০০ (৩৯)	১০০ (১৩)	১০০ (১৩)	১০০ (৩)	১০০ (১৩)	১০০ (৩)	১০০ (৭)	১০০ (৩)	১০০ (৩)	১০০ (৩)
	২৬২	৭৩	৭৪	১৭	৭২	১৭	৩৮	১৫	১৫	১২

...দের গ্রুপ হল বছরে যা আয় হয় তাতে চলেনা, মাঝে মধ্যে ঋণ করতে হয় অথবা উপোষ থাকতে হয় তাদের,
...ন রকম দিন চলে যায়, গ = ভালভাবে চলে, ঘ = চলার পরও কিছু উদ্বৃত্ত থাকে যা দিয়ে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া ও অন্যান্য খরচ চলে,
... খরচ দিয়েও সঞ্চয়যোগ্য উদ্বৃত্ত থাকে। বিত্তের ভিত্তিতে এদেরকে নিম্ন মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত এবং উচ্চ বিত্ত গ্রুপ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।
...র বন্ধনীর ভিতর সারিবদ্ধভাবে এবং বন্ধনীর বাইরে সুক্ষ্মাকারে সাজানো হয়েছে।

BIDS Library
E-17, Agargaon, Dhaka
Acc.# 86938
Date: 22-10-1987

B. I. D. S. LIBRARY
DHAKA
Acc. No. ...
Date ...

আলাপ করে দেখা গেছে যে, অনেক সময় এক জমি একজন বর্গাদারকে বেশী সময়ের জন্য পত্তন দেয়া হয় না। এর আসল কারণ হল, এ সমস্ত অধিকাংশ জমির মালিক প্রকৃত স্বত্বাধিকারক নয়। দাংগা-হাংগামার সুযোগে এরা এসমস্ত জমি দখল করে নেয় এবং তাদের ভয়, বেশী সময় কারো দখলে থাকলে মালিকানার স্বত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। পর্যবেক্ষন করলে দেখা যাবে যে, অভাবে অনটনে ক্ষুদে কৃষকেরা জমি বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে এবং যাদের কৃষির সাথে কোন যোগাযোগ নেই তারাই ক্রয় করছেন।

এতে অনুপস্থিত জমি মালিকের সংখ্যা, ভূমিহীনের সংখ্যাবৃদ্ধির সাথে বাড়ছে। ভূমি ব্যবহারের (হারিয়া গ্রামের) উপর আলোকপাত করলে দেখা যাবে যে, মোট মালিকানাধীন জমির ৭১% চাষের জমি, ৭% পুকুর, ১.৭% বাগান এবং ১১.৩% জমি ৩১১ টি পরিবারের বসতবাড়ী হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ জমিগুলোর একটি বিরাট অংশ শস্য-ফলফলাদি উৎপাদন বৃদ্ধিতে কাজে লাগানো যেত। বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এ' বসতবাড়ীগুলো যদি কেন্দ্রীভূত করা যেত, তাহলে চোর ডাকাতের উপদ্রব কম হত এবং বাসস্থানগত সমস্যা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ এবং সংস্কৃতিমূলক অনেক বিষয়ে কম খরচে ব্যবস্থা নেয়া যেত। এটি সত্য যে, এধরনের পদক্ষেপ সামাজিক পরিবর্তনের সাথে জড়িত।

জমি স্তরের প্রকৃতি আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, শতকরা ৭০ ভাগ জমি মধ্যম এবং উঁচু স্তরের। বর্ষের মেঘনা নদী বিধৌত পলিমাটিতে এগুলো খুব উর্বর। সারা বছর এখানে ফসল ফলানো সম্ভব। রবিশস্য হয় প্রচুর এবং স্থানীয় অধিবাসীরা করছেও। তবে লাভের কোন হদিস নেই এতে এবং তার ফলন দিয়েও পত্তনের টাকা মিটিয়ে যা থাকে তাতে বর্গাচাষীদের জীবনযাত্রার মান বেশী বৃদ্ধি সম্ভব হয়ে উঠে না।

বাজারের অবস্থা এবং কৃষি দ্রব্যের মূল্যের উঠানামার উপর কৃষকদের কোন হাত নেই। সার ও বীজ নিয়মিত এবং প্রয়োজন মাফিক পাওয়া সম্ভবপর হয়ে উঠে না। আধুনিক কোন সেচ ব্যবস্থা গ্রাম অঞ্চলে এখনও গড়ে উঠেনি। পাশের কুয়া, পুকুর ও খাল থেকে এরা রবিশস্যে পানি দেয়। পর্যবেক্ষন করলে দেখা যাবে যে, মজা খালগুলোকে যদি সংস্কার করা হয় এবং মেঘনা নদী থেকে যদি জোয়ারের পানি দিয়ে এ সমস্ত খালগুলো ভর্তি করে জলসেচের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে কম খরচে রবিশস্যের একর প্রতি উৎপাদন বাড়ানো যাবে, এবং এতে ইরি ধান সহ বিভিন্ন শস্য উৎপাদনে জমির আরো বেশী ব্যবহার করা যেত, তাতে করে কৃষকদের সংগঠিত হওয়ারও একটা সুযোগ হত।

একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, ঢাকার বাজারের তুলনায় কৃষকরা পাইকারদের নিকট অনেক কম দামেই বিক্রি করে, সমবায়ের মাধ্যমে কৃষকরা কৃষি পণ্য বাজারজাত করতে পারলে ন্যায্য মূল্যের সুযোগ পেত এবং মধ্যস্বত্বভোগী মানুষের হাত থেকে রেহাই পেত। এতে ভোগকারী জনসাধারণ ও এ সব কৃষিজাত দ্রব্যগুলো কম দামে ক্রয়ের সুযোগ পেত।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট যে, অধিকতর শস্য উৎপাদনের লক্ষ্যে ভূমি সংস্কার সহ উৎপাদনের উপকরণের যথাযথ সরবরাহ এবং উৎপাদিত শস্যের বাজারজাত করণে কৃষকদের জন্য সুনিশ্চিতকরণের মূল্য ব্যবস্থা, কৃষি কাজের উপর উন্নত জ্ঞান বিতরণ ও ক্ষুদে ও গরীব কৃষক এবং বর্গাচাষীদের ঋণদানের সুযোগ করে দেয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কর্মজীবি মানুষের পেশার অবস্থা আলোচনাকালে তাদের অব্যবহৃত দক্ষতারও কিছু তথ্য বিবেচনা করা উচিত। অনেকের নিজস্ব পেশা ছাড়াও অন্য পেশায় নিয়োজিত হওয়ার ক্ষমতা রয়েছে যা বিভিন্ন কারণে অব্যবহৃত থাকছে। হারিয়া গ্রামের উপর জরীপে দেখা গেছে যে, ৫৪৫ কর্মক্ষম সদস্যদের ২১৬ জন অর্থাৎ ৪০% লোকের বিভিন্ন অব্যবহৃত দক্ষতা রয়েছে। এদের মধ্যে ১১১ জনের ব্যবসার অভিজ্ঞতা রয়েছে ৪০ জনের সেলাই ও অন্যান্য শিল্প কর্মের অভিজ্ঞতা রয়েছে। এসব অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা ব্যবহার করে যে মূলধন প্রয়োজন তা এদের কারোরই নেই। ৩৪ জনের চাষ বাসের অভিজ্ঞতা ছিল একসময়। কিন্তু, বেঘনার ভাংগনে ভূমিহীনে পরিণত হওয়ার পর দিনমজুরী অথবা ছোটখাট ব্যবসা করে এরা আজ কালাতিপাত করছে। এসবের অর্থ হল কর্মসংস্থান সম্প্রসারণের যথেষ্ট চাহিদা এবং ক্ষমতা রয়েছে এ এলাকায়।

প্রধান পেশায় পরিবারের ভরণপোষণ হয় না বলে অথবা পারিবারিক আয় বৃদ্ধি করে অথবা কর্মক্ষম সদস্য বেশী বলে অনেক পরিবার প্রধানের এবং কর্মক্ষম সদস্যদের বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হতে দেখা যায়। দেখা গেছে যে, বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হলে পারিবারিক আয় বৃদ্ধি পায়। প্রধান পেশা ধরনের সাথে উপপেশাগুলোর একটা যোগসূত্রও খুঁজে পাওয়া যায়।

সারণী - ৩

প্রধান পেশার সাথে উপপেশার যোগসূত্র (হারিয়া গ্রামের তথ্যের ভিত্তিতে)

প্রধান পেশা	% উপপেশা							
	কৃষি	ব্যবসা			মজুরী শ্রম	চাকুরী	মাছধরা	শিল্প
		ফুলী	মাছ	অন্যান্য				
১। কৃষি	-	২৯.৩ (৭০.৬)	২.৪৩ (১০০)	২২ (৪২.৮)	৩৯.৩২ (৮০)	৪.৮৭ (৬৭)	-	২.৪৩ (৩৩.৩৩)
২। ব্যবসা								
ক) ফুলী	৮১ (৪১.৫)	-	-	১৯.০০ (১৯.০৪)	-	-	-	-
খ) মাছ	২০ (২.৪)	৪০ (১১.৭)	-	২০ (৪.৭)	-	-	২০ (৫০)	-
গ) অন্যান্য	৪৫.৫ (১৩)	৯ (৫.৮)	-	২৭.৩ (২৭.৩)	৯ (৫)	৯ (৩৩)	-	-
৩। মজুরী শ্রম	৭১.৪৩ (৩৬.৫)	-	-	৯.৫২ (৯.৫২)	১৪.২৯ (১৫)	-	৪.৭৬ (৫০)	
৪। চাকুরী	২০ (২.৪)	৪০ (১১.৮)	-	২০ (৪.৭৬)	-	-	-	২০ (৩৩.৩৩)
৫। মাছধরা	-	-	-	-	-	-	-	-
৬। শিল্প	১০০ (২.৪)	-	-	-	-	-	-	-
৭। পরিবহন কাজ	৫০ (১২.৪)	-	-	৫০ (৭.৭৬)	-	-	-	-
মোট কর্মক্ষম সদস্য ১০৮ -	৪১% (১০০)	২৭% (১০০)	১% (১০০)	২১% (১০০)	২% (১০০)	৩% (১০০)	২% (১০০)	৩% (১০০)

বিঃদ্রঃ সারণীতে বন্ধনীর ভেতরের শতকরা হার স্তম্ভাকারে এবং বন্ধনীর বাইরে শতকরা হার সারিবদ্ধভাবে সাজানো হয়েছে।

সারণী ৩ থেকে সম্পষ্ট যে, গ্রামের কর্মজীবি মানুষদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ (৫৪৫ জনের মধ্যে ১০৮ জন অর্থাৎ ২০% লোক) একটির বেশী পেশায় নিয়োজিত। উপপেশার মধ্যে কৃষি (৪১%) এবং ব্যবসায়ই (৪৯%) প্রধান। কৃষি যাদের প্রধান পেশা, উপপেশা হিসেবে ব্যবসা (৫১%) এবং দিনমজুরী (৩৯%) কে বেশী গ্রহন করেছে। ব্যবসা যাদের প্রধান পেশা কৃষিকেই (৫৬%) তারা প্রধান উপপেশা হিসাবে নিয়েছে। আবার এক ব্যবসার লোক অন্য ব্যবসাকে আয়ের দ্বিতীয় উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছে। ক্ষুদে ব্যবসায়িদের কিয়দাংশ দিনমজুরের কাজ এবং ছোট খাট চাকুরীও করতে দেখা যায়, মজুরী শ্রম যাদের প্রধান পেশা উপপেশা হিসাবে জমির (৭১%) প্রতিই তাদের দৃষ্টি বেশী রয়েছে, চাকুরীজীবিদের বেশ কিছু সংখ্যক লোক ব্যবসাতেও নিয়োজিত। মাছ ধরা যাদের প্রধান পেশা তাদের পেশাগত স্থান পরিবর্তন নেই বললেই চলে। মৎস্যজীবিদের একজনও উপপেশায় নিয়োজিত হতে দেখা যায়নি, তবে রামগঞ্জ গ্রামে মৎস্যজীবিদের কিছু কিছু মাছের আড়তদারী মাছের খুছরো ব্যবসা, জালতৈরী এবং ব্যবসা করতে দেখা গেছে। শিল্পে নিয়োজিত ব্যক্তিদের উপপেশা হিসেবে কৃষিকে দেখা গেছে। মূলধনের অভাব হেতু ব্যবসাতে যেতে পারেনি এরা। উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, উপপেশাও নির্ভর করে প্রধান পেশার ধরন, পরিবারের মূলধন এবং কর্মক্ষম সদস্যের সংখ্যার উপর। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, যে সমস্ত পরিবার একাধিক পেশায় নিয়োজিত, তারাই বেশী স্বচ্ছল জীবন যাপন করছে। আবার বেশী: পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের অধিকাংশরই জমি, মূলধন এবং কর্মক্ষম সদস্য অপেক্ষাকৃত বেশী। এসব তথ্য স্থানীয় কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও সম্প্রসারণের পরিকল্পনা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণভাবে বিবেচনার বিষয়।

এখানে অর্দ্ধবেকারের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য থাকলেও একেবারে বেকার কর্মক্ষম সদস্যের সংখ্যা নিতান্তই কম। হারিয়া গ্রামের ১০ বৎসরের উপরে যারা নিজেদের বেকার বলে চিহ্নিত করার প্রয়াস পেয়েছে এবং কাজের খোজে রয়েছে তারা ৬৬০ জন কর্মক্ষম পুরুষ সদস্যের মধ্যে মাত্র ৩৮ জন অর্থাৎ ৫·৩%। তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, এদের অধিকাংশই একেবারে তরুণ অর্থাৎ ১০ থেকে ১৫ বৎসরের মধ্যে। পারিবারিক আর্থিক দূরবস্থার শিকার হয়ে এরা কাজের সন্ধান করছে, এদের অধিকাংশই নিরক্ষর (৮৫%)। ১০ থেকে ১২ বৎসরের ১৮জন বেকার ছেলের ১৫ জনই অর্থাৎ ৯০% একেবারে নিরক্ষর। ১৩ থেকে ১৫ বৎসরের ১০ জনের ৫ অর্থাৎ ৫০% জনই নিরক্ষর।

তবে বয়স্ক বেকারদের শিক্ষার মান বেশী। এদের অধিকাংশই শিক্ষিত বেকার হিসেবে পরিচিত, ১৬ থেকে ২০ বৎসরের ৫ জন বেকারের ২ জনই নবম শ্রেণী পর্যন্ত এবং একজন এস,এস,সি পাশ। ২১ থেকে ২৫ বৎসরের মধ্যে একজনও ৮ম শ্রেণীর নীচে নেই, একজন এস,এস,সি পাশ। এদের সমস্যা চাপা পড়ে আছে এবং এদের কাজের অন্বেষণে হন্যে হয়ে ঘোরাফেরা জনমনে পড়াশুনার প্রতি বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি করতে সহায়তা করছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করে অচিরেই এদের কর্ম সংস্থান প্রয়োজন। অল্প বয়সের বেকারদের পরিবারগুলো অধিকাংশই নিম্নবিত্ত। ১০ থেকে ১২ বছরের বয়সের ১৮ জনের মধ্যে ১৪ জন এবং ১৩-১৫ বৎসরের বেকার ছেলেদের ১০ জনের পরিবার কোন মতে দিন কালাতিপাত করছে। এদের অধিকাংশই ভূমিহীন। প্রথমোক্ত গ্রুপের ১৮ জনের ১৪টি পরিবার এবং পরের ১০ জনের ৭টি পরিবার ভূমিহীন। অপরপক্ষে ১৬ থেকে উপরের বয়সের বেকারদের কোন পরিবারই নিম্নবিত্ত নহে। দুটো পরিবার মধ্যবিত্ত, আর বাকীগুলো উচ্চবিত্ত পরিবারের এবং এদের নিজস্ব চাষাধীন জমি কারো কারোর ২ একরেরও বেশী। এ গ্রুপের বেকারেরা প্রায় সবাই শিক্ষিত বেকার এবং কর্ম ছাড়া জীবিকা নির্বাহ করার পারিবারিক ক্ষমতা রয়েছে এবং এরা চাকুরী পেতে অথবা ব্যবসার জন্য পুঁজি পেতে আগ্রহী। প্রথমোক্ত বেকাররা সুস্থঃ বিধায় কিছু প্রশিক্ষণ, প্রাসংগিক ক্রিয়াকর্মে উপকরণ সরবরাহ এবং প্রয়োজনীয় ঋণের এবং উৎপাদনের জন্য যথাযথ পরামর্শ এবং উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার জাতকরণের ব্যবস্থা করতে পারলে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে নিতে পারত।

গবাদি পশু পাখী পালন ঃ

কৃষির সাথে সম্পৃক্ত গবাদি পশু ও পাখী পালন করে পারিবারিক আয় বৃদ্ধি করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও এসব কর্মকান্ডের উপর যে চিত্র আমরা পাই তা হতাশাব্যঞ্জক। ভূমিকর্ষনে, শস্য মাড়াতে, দুগ্ধ এবং মাংস সরবরাহে গবাদি পশু উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করলেও গ্রামগুলির ৬১৩টি পরিবারের মাত্র ৫৩টি অর্থাৎ ৯% পরিবারে ৮৯টি ষাঁড় এবং ১৭৮টি অর্থাৎ ২৯% পরিবারে ২৭৮টি গাভী রয়েছে। ছাগলের সংখ্যাও অনেক কম। ১৬০টি অর্থাৎ ২৬% পরিবারে ২৫৯টি। বাংলাদেশ কৃষি শুমারী অনুযায়ী জাতীয় পর্যায়ে ৫২.৫% পরিবার গো-মহিষাদি পালন করে এবং পালনকারী পরিবার প্রতি এদের সংখ্যা গড়ে ৩.০৪টি। ছাগলও ভেড়া পালনকারী পরিবার মোট পরিবারের ৩৮% এবং পালনকারী পরিবারপ্রতি গড়ে সংখ্যা ২.৭২টা। এতে বিরাট এ বৈসাদৃশ্যের চিত্র ফুটে উঠে।[১]

অধ্যুষিত গ্রামগুলোতে : গাভী পালনকারী পরিবারের ভাগ ২৯% অর্থাৎ অন্যান্য গবাদি পশু পালনের তুলনায় অনেক বেশী, তবুও এদের সংখ্যাও নিতান্ত কম। গাভীর পরই ছাগল পালনের স্থান। সবচেয়ে কম হল ষাঁড় পালনকারী পরিবার। হালের বলদের সংখ্যা কম হওয়াতে কৃষি কাজের অসুবিধে হলেও এ এলাকার হালের বদলে কোদালের ব্যবহার অত্যাধিক হওয়াতে হালের গরুর অভাব সহজে চোখে ধরা পড়েনা। ষাঁড়কে যদি আমরা হালের বলদ হিসাবে ধরি, তাহলে ষাঁড় পালনকারী পরিবারগুলোতে গড়ে দুটো ষাঁড় (বলদ) থাকা প্রয়োজন। অথচ ৫৩ পরিবার অর্থাৎ ৮% পরিবারের ষাঁড় আছে এবং গড়ে এক জোড়া থেকেও কম।

গো- সম্পদ বাড়ানোর ব্যাপারে এবং দুধ সরবরাহে গাভী পালনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। দুধের যে দাম, তাতে ২ সের দুধ দেয়ার ২টি গাভী পালন করে ২টি ছোটখাটো পরিবার স্বচ্ছন্দে চলতে পারে। গাভী পালন লাভজনক হলেও এবং দুধের দাম ও চাহিদা বেশী হলেও খুব কম সংখ্যক পরিবারে (২২%) গাভী পালন করা হয়। আবার পরিবার প্রতি গাভীর সংখ্যাও ১·৬৭'র বেশী নয়। গাভী পালনকারী পরিবারগুলোর পারিবারিক পেশা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, এরা অধিকাংশই কৃষক। এর প্রধান কারণ হল, জমির আইলে যে ঘাস উৎপন্ন হয়, ফসল মাড়ানোর পর যে খড় কুটা হয়, ধান ও গম ভাংগানোর পর যে তুষি হয়, ওগুলো দিয়ে গাভীর খাদ্য সমস্যা বিনাপুঁজিতে অথবা স্বল্পপুঁজিতে সমাধান করা সহজ হয়। আবার ফসল বাড়ানোর পর ভূমিকর্ষনেও গাভী সাহায্য করে। ফলে কৃষকেরা গাভী পালন করে দু'দিকে লাভবান হয়। কৃষকেরাই বেশী সংখ্যক গাভী পালন করতে পারে। প্রমাণস্বরূপ কৃষি প্রধান গ্রামে পরিবার প্রতি গাভীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। কৃষকের পর ব্যবসায়ীদের স্থান এজন্য যে, গাভী পালনের প্রয়োজনীয় পুঁজি এবং এদের সবার কিছু না কিছু জমি থাকার ফলে খাদ্য ও বাসস্থান জনিত সমস্যা সমাধানের সুবিধে রয়েছে। দিনমুর এবং জেলে সম্প্রদায় গাভীপালনে সবচেয়ে পিছনে রয়েছে। এর প্রধান কারণ হল, গাভীর খাদ্য সরবরাহে, বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে অপেক্ষাকৃত বেশী সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এদের। গাভী পালনকারী পরিবারগুলোর প্রায় অর্ধেকের ১ একরের বেশী জমি রয়েছে। শুধু ১০টি অর্থাৎ ১৬% পরিবার ভূমিহীন। এর অর্থ হল, কিছু খাদ্য সংস্থানও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে সক্ষম পরিবার ছাড়া গাভী পালন করে খুব কমই। যদিও যাদের খাদ্য দ্রব্যের পুঁজি এবং খাদ্য উৎপাদনের জন্য জমি এবং ফসল রয়েছে শুধু তারাই গাভী পালন করতে পারে। তবুও

নিম্নবিত্ত অথবা মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোই (৭৭%) বেশীর ভাগ গাভীর অধিকারী। কারণ, উচ্চ বিত্তের অনেকে ঝামেলার জন্য গাভী পালন করে না। নিম্নমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারে পারিবারিক শ্রম উদ্বৃত্তকে কাজে লাগানোর জন্য গাভীপালন গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা উচ্চ বিত্তদের জন্য প্রযোজ্য নয়। তাদের বেলায় মজুর শ্রম দিয়ে গাভী পালিত হয়। লাভক্ষতির হিসেবে প্রথম শ্রেণীর পরিবারগুলো স্বভাবতই অধিকতর ভাল অবস্থায় থাকে।

গাভী পালনে রোগের উপদ্রব ও একটা সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। উপজিলা পর্যায়ে পশু-চিকিৎসা বিভাগ খুবই দুর্বল ভূমিকা পালন করছে। পর্যাপ্ত ঔষধ সরবরাহের অভাব এবং সময়মত তাওশরী চিকিৎসার অভাব অনেক গাভীর মৃত্যুর কারণহিসেবে দাঁড়িয়েছে। প্রতিরোধমূলক এবং আরোগ্যমূলক ঔষধ পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তার কথা স্থানীয় জনসাধারণ অনুভব করছে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গাভী পালনে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ঋণদান এবং ন্যায্যমূল্যে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করতে পারলে প্রচুর সুফল পাওয়া যেত। বিদেশ থেকে অল্প দামের গম, ভুট্টা ও অন্যান্য শস্য আমদানীর ব্যবস্থা করে যথাযথ প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে গবাদি পশুর খাদ্য সম্ভার সৃষ্টি করলে পশু খাদ্যের ঘাটতিজনিত সমস্যা (অন্যান্য পশু পাখীর মতই) গার্ভীপালনে এত বড় বাধা হয়ে থাকত না। ছাগল পালন ও লাভজনক কর্ম। ছাগল দামে কম এবং গরীব পরিবারগুলো ছাগল পালনের মাধ্যমে তাদের শ্রম উদ্বৃত্ত কাজে লাগানোর সুযোগ করে। ছাগল প্রায় $\frac{১}{৪}$ ভাগ পরিবার পালন করে এবং ছাগল পালনকারী পরিবারের গড়ে ১.৬২টি ছাগল রয়েছে। দুটো পরিবার ৩টি মাত্র ভেড়া পালন করে, সঠিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, এ সমস্ত গ্রামগুলোতে সংগঠিতভাবে পশু উন্নয়ন প্রকল্প চালু করার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

দেশের খাদ্য এবং প্রোটিন ঘাটতির অবস্থায় পর্যাপ্ত মাংস এবং ডিম সরবরাহের মাধ্যমে আমাদের প্রয়োজনীয় প্রোটিনের অভাব মিটাতে হাসঁমুরগী পালনের সবিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। বর্তমানে দেশের মাংস উৎপাদনের শতকরা প্রায় ২২ ভাগ মুরগীর মাংস থেকে আসে এবং পশুপাখীজাত প্রোটিনের শতকরা ৬.৬৬ ডিম এবং ১২ ভাগ মুরগী থেকে আসে। অথচ গত দশ বছরে মাথাপিছু পশু এবং মুরগী উৎপাদন শতকরা প্রায় ৪ ভাগ কমে গিয়েছে। দুধ, গো-মহিষাদির মাংস ও মাছের সীমিত সরবরাহের বর্তমান অবস্থায় মুরগী এবং ডিমের চাহিদা এবং মূল্য যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামগুলোতে ৬১৩টি পরিবারের মধ্যে মাত্র ৫৪% পরিবার মোরগ-মুরগী পালন করে।

অথচ জাতীয় পর্যায়ে এ সংখ্যা ৭৪%। অনেক গ্রাম রয়েছে, যেখানে মাত্র $\frac{১}{৩}$ ভাগ পরিবার মোরগ-মুরগী পালন করে। অথচ একটু চেষ্টা করলে মোরগ মুরগী পালন করে পারিবারিক আয় বৃদ্ধি করা যায়। আবার মুরগী পালনকারী পরিবারগুলো মাথাপিছু মুরগীর সংখ্যা ও নিতান্ত কম (৫.২টি)। জাতীয় পর্যায়ে পালনকারী পরিবার প্রতি মোরগ মুরগীর সংখ্যা ৭.২। বস্তুতঃ মোরগ-মুরগী পালন লাভজনক পেশাহিসেবে প্রতিষ্ঠা করে দরিদ্র জনগোষ্ঠির আয়বৃদ্ধিতে, খাদ্য সমস্যা লাঘবে এবং বাড়ীতে প্রচুর অবসরে থাকা মহিলাদের কর্মসংস্থানের সচেষ্ট হওয়ার প্রচুর অবকাশ রয়েছে। হিসেব করে দেখা গেছে যে এ' এলাকায় ৫টি মুরগীর খামার থেকে বছরে ১৫০০ টাকার অধিক লাভ হতে পারে। কৃষি পরিবারের জন্য মোরগ-মুরগী ভরণপোষণের ব্যাপারে খরচাদি কম পড়বে, কারণ বাড়ীর চারপাশে এবং ফেলে দেয়া শস্য কণা থেকেও খাদ্য পাওয়া যাবে। তবে ভূমিহীন পরিবারগুলোর সমস্যা রয়েছে। কারণ একদিকে মুরগী চরে বেড়ানোর মত জায়গা তাদের নেই এবং নিয়মিত খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থার ব্যাপারে তাদের অসুবিধে রয়েছে। এর অর্থ এই যে, তাদের মোরগ-মুরগী পালন কালে বাজার থেকে খাদ্য ক্রয় করতে হবে, যা নিরুৎসাহের বিষয়। অবশ্য তাদের পরিবারে মহিলা এবং বাচ্চাদের কাজে লাগানো যাবে বেশী পরিমানে। ফলে মোরগ-মুরগী ক্রয়ে, খাদ্য সরবরাহে, ঘরও বাড়ীতেরী ইত্যাদিতে সাহায্যের একান্ত প্রয়োজন। বিভিন্ন মৌসুমে রোগের জন্য প্রতিরোধমূলক এবং সময়ে বিভিন্ন রোগের জন্য প্রতিরোধও আরোগ্যমূলক ঔষধপত্রের এবং চিকিৎসার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি। যারফলে প্রত্যেক বছরে বিপুল সংখ্যক মোরগ-মুরগীর মৃত্যুজনিত কারণে জনসাধারণের যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হয়। বাড়ীঘর নোংরা, বিরক্তিকর চলাফেরা, রবিশস্যের ক্ষতি, প্রতিবেশীদের সাথে এ নিয়ে ঝগড়াঝাটি মোরগ- মুরগী পালনে নিরুৎসাহিত করে। উন্নত জাতের মোরগের মাধ্যমে সংকর জাতকরনের ব্যবস্থা, সস্তায় খাদ্য সরবরাহ, প্রতিরোধমূলক টীকা এবং নিয়মিত ঔষধপত্রের ব্যবস্থা এবং মুরগী ক্রয় এদের বাসস্থান ও খাদ্যের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজি সরবরাহ এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মুরগী পালনের উপর যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।

হাঁস পালনের জন্য বেশী পুঁজির প্রয়োজন না হলেও হারিয়ে যাওয়ার ভয় এবং শস্য নষ্টের কারণে এবং প্রতিবেশীদের সাথে ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকে মূলতঃ এজন্য অনেকে হাঁসপালনে নিরুৎসাহিত হয়। হাঁসের জন্য পুকুর প্রয়োজন হয়। হাঁস বেশী নোংরা করে। খাল বিলের পথ

খেয়ে বেশী দূরে চলে গেলে মেয়ে মানুষ ওগুলো নিয়ে ভীষণ অসুবিধায় পড়তে হয়। অনেক সময় চুরও হয়ে যায়। এ'সব কারণেও হাসঁপালনে অনেকেরই নিরুৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। উন্নত জাতের হাঁস সরবরাহ, নিয়মিত ঔষধপত্রের ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারলে মাছ চাষের সাথে সাথে হাঁস পালন একটা লাভজনক কাজ হিসেবে পরিণত হতে পারত।

মৎস্য চাষঃ

এ এলাকায় অনেক হাজামজা পুকুর, বিলও খাল রয়েছে, যেগুলো যথাযথ সংস্কার করে মাছের চাষ করা যেত। হারিয়া গ্রামের উপর জরীপে দেখা গেছে যে, এ গ্রামে ৩০টি পুকুরে মোট জমির পরিমাণ হল ১৬'৪৫ একর অর্থাৎ পুকুরের গড় আয়তন জাতীয় গড় ১'২৮ একর থেকে অনেক কম। ১১
মালিকের সংখ্যা ১১৫ যার অর্থ হল মালিক প্রতি পুকুরের অংশ '১৪ একর। জাতীয় পর্যায়ে মোট পরিবারের প্রেক্ষিতে পুকুর মালিকের সংখ্যার অনুপাত হল '৫ঃ১। এদের অর্ধেকেরও বেশীতে মাছ চাষ হয় না। অধিকাংশ পুকুরগুলোরই পাড় নেই। আর যেগুলোর রয়েছে বর্ষাকালে প্রায়ই ডুবে যায়। যার ফলে মৎস্য চাষে সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। অনেকের মতে মাছের পোনার গুণে অথবা মাটি খারাপ বিধায় মাছ বেশী হয় না। তবে আমাদের মতে হয়েছে তব, মৎস্য চাষে স্থানীয় জনসাধারণের যথাযথ জ্ঞানের অভাব রয়েছে। এছাড়া ইচ্ছা থাকলেও অনেক পুকুরের যৌথ মালিকানা থাকার জন্য মৎস্য চাষে উৎসাহ পাওয়া যায়না । ইজারায় পুকুর রেখে অনেকে ক্ষতি হওয়ার আশংকা করে অনেকে খনন ও পানি সেচ বাবদ প্রচুর অর্থের যোগানের সমস্যা সংক্রান্ত অসুবিধা ভোগ করছে। ফলে প্রচুর সম্ভাবনা সত্ত্বেও মৎস্য চাষ তেমন কোন উৎসাহ পাচ্ছেনা এ এলাকায়। আমাদের মনে হয়েছে, কয়েক বছর ইজারা নিয়ে সমস্ত পুকুর চাষ করে মৎস্য চাষকে লাভজনক পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে স্থানীয় জনগণের হাতে ছেড়ে দিলে মৎস্য চাষ উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ এবং পোনা সরবরাহ এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজনীয়। মাটির উপযুক্ততা অনুযায়ী চাষের জন্য মাছের ধরণ নির্বাচন করতে হবে। খাল-বিলগুলোতে মাছ চাষের ব্যবস্থা করলেও আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেত। মাছের আকার বৃদ্ধি করনের লক্ষ্যে উপযুক্ত খাবারেরও ব্যবস্থা করতে হবে। মেঘনা নদীর সাথে সংযোগ রক্ষা করে চিংড়ি মাছের চাষ উন্নত করা যেত এখানে।

৩ • অভূমি সম্পত্তির মালিকানাঃ

কৃষি ভিত্তিক গ্রামীণ অর্থনীতিতে ভূমি প্রধান সম্পদ হলেও অভূমি সম্পত্তি ও উৎপাদনে এবং পারিবারিক আয় বৃদ্ধিতে একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু অভূমি সম্পত্তির মালিকানায়ও ভূমি মালিকানার মত একটা বৈষম্যের ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ পরিবার (প্রায় ৭০%) খুবই অল্প অভূমি সম্পত্তির মালিক এবং অভূমি সম্পত্তির মাত্র ৮% সত্ত্বাধিকারী। ৩৮% পরিবারের অভূমি সম্পত্তি রয়েছে ৫00 টাকারও নিম্নে। অন্যদিকে ৪•৩৭% পরিবার ৩0000 টাকার উপরে অভূমি সম্পত্তির মালিকানা ভোগ করে এবং সমস্ত অভূমি সম্পত্তির ৬৩% স্বত্ব ভোগ করে। এর অর্থ এই যে, গ্রামের অধিকাংশ লোক স্বল্প সম্পত্তির মালিক। হিসেব করলে দেখা যাবে যে, নীচের ২0% অভূমি সম্পত্তি মালিকের গ্রুপ মাত্র ০৬% অভূমি সম্পত্তির স্বত্ব ভোগ করে, অথচ উপরের ২0% পরিবার ৬৭% অভূমি সম্পত্তির মালিকানা ভোগ করে। অর্থাৎ নিম্নের গ্রুপ থেকে উপরের গ্রুপ ১৮৬ গুণ বেশী অভূমি সম্পত্তির মালিক।। ৫0000 টাকার উর্ধে অভূমি সম্পত্তির ৯টি অর্থাৎ ২•৮% পরিবার গ্রামের ৫৭% অভূমি মালিকানা ভোগ করে। মাথাপিছু সম্পত্তির পরিমাণ গড় নিম্নগ্রুপ ...৩১ টাকা থেকে উচ্চ গ্রুপে গড় ১৭০৬২ টাকাতে বেড়েছে। তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে ভূমি মালিকানার সাথে অভূমি সম্পত্তি মালিকানার একটি নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে। ভূমিহীনদের যাদের নিজ গৃহও নেই তাদের ১৮টি পরিবারের ১৪টি পরিবারের অভূমি সম্পত্তি ৫00 টাকার নীচে এবং যাদের বাড়ী আছে অথচ কোন জমি নেই তাদের মধ্যে ৪৬% পরিবারের অভূমি সম্পত্তি ৫00 টাকার নীচে। ৪000 টাকার উপরে অভূমি সম্পত্তি রয়েছে ভূমিহীনদের মাত্র $\frac{১}{৪}$ ভাগের। •0১-•৩৩ একর জমির গ্রুপের ৫৫টি পরিবারের ৪৮টি (৮0%) পরিবারেই ৪000 টাকার নীচে অভূমি সম্পত্তির পরিমাণ •৩৪-•৫0 একর জমির গ্রুপে ৭৫% পরিবারেই ৪000 টাকার নীচে সম্পত্তির মালিক।

৩ একরের উর্ধে জমির গ্রুপে কোন পরিবারের অভূমি সম্পত্তির পরিমাণ ২000 টাকার নীচে নয় এবং অধিকাংশেরই ৫00 টাকার উর্ধে। অতএব জমির পরিমাণের সাথে অভূমি সম্পত্তির পরিমাণের একটা সম্পর্ক রয়েছে, এটা সহজেই অনুমেয়। লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, যারা এ' এলাকার বড় ব্যবসায়ী পুঁজিপতি তারা প্রাথমিক পুঁজি কৃষি জমি থেকে সঞ্চয় করে এবং পরে পুঁজি বিনিয়োগের উপর যে লাভ হয় সেটা ব্যবসায়, চাউলের কলে, গৃহ নির্মাণে এবং জমিক্রয়ে

খরচ করে এলাকায় নিজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধির প্রয়াস পায়। অতএব, পুঁজি গঠন এবং জমির মালিকানার একটা সরাসরি ও ওতোপ্রোত পারস্পরিক সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যাবে। তবে ভূমি মালিকানা অভূমি সম্পদের পরিমানের উপর যে রকম প্রভাব ফেলে, অভূমি সম্পদ ভূমি মালিকানার ওপর ওরকম প্রভাব বিস্তার করেনা।[১১] অভূমি সম্পত্তির মালিকানার সাথে পেশার একটা সম্পর্ক দেখা যেতে পারে।

সারণী – ৪.

অভূমি সম্পত্তির মালিকানা ও পেশাগত বন্টন(%) (হোরিয়া গ্রাম)

পেশা / অভূমির সম্পত্তির মালিকানা (টাকায়)	কৃষি	ব্যবসা			শ্রম মজুরী	পরি-বহন	চাকুরী	শিল্প	মাছধরা	অন্যান্য	মোট (নিয়োজিত সদস্য)
		মুদী	মাছ	অন্যান্য							
১ – ৫০০	৩০	১	৬	১১	৩০.৪	২	৯	৬	৩	৭	১০০ (১৬১)
৫০১–১০০০	৪০	১৬	৪	২০	৮	–	১২	–	–	–	১০০ (৫১)
১০০১–২০০০	৫৭	২	৪	৯	১৪	৪	৮	–	–	২	১০০ (৫১)
২০০১–৩০০০	৬২	১২	–	৫	১৪	৫	–	২	–	–	১০০ (৪২)
৩০০১–৪০০০	৪৮	২০	৫	৯	৯	–	৯	–	–	–	১০০ (৫৬)
৪০০১–৫০০০	৪৮	১২	৫	১২	৫	৩	১২	৩	–	–	১০০ (৩৩)
৫০০১–১০০০০	৫৫	১১	–	১০	২	–	২	৬	৬	–	১০০ (৮০)
১০০০১–২০০০০	১১	১৭	৫	৩১	–	৮	৬	–	১৪	–	১০০ (১৬)
২০০০১+	১০	৩৫	১৫	২৬	–	৮	৮	–	–	–	১০০ (৫৩)
মোট= নিয়োজিত সদস্য =	৩১ (২১২)	১০ (৭৪)	৩ (১৭)	১০ (৭২)	১০ (৪০)	৩ (১৫)	৩ (৩৮)	৭ (১৭)	৩ (১৫)	৩ (১২)	১০০ (৫৪৫)

উপরের সারণী থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, স্বল্প অভূমি সম্পত্তির মালিকদের (-৫০০/) অধিকাংশই কৃষক দিনমজুর এবং ক্ষুদেব্যবসায়ু। আর অন্যদিকে বৃহৎ অভূমি সম্পত্তি মালিক(২০০০১+) দের অধিকাংশই ব্যবসায় এবং খুব স্বল্প সংখ্যক কৃষিকাজে নিয়োজিত রয়েছে। ১০০০০ টাকা পর্যন্ত অভূমি সম্পত্তি মালিকানায় কৃষির প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়। ১০০০০ টাকার উপরে যাদের অভূমি সম্পত্তি (পুঁজিসহ) রয়েছে তাদের অধিকাংশই ভূমির সাথে যেমন একটা সম্পর্ক রয়েছে, তেমনি অভূমি মালিকানারও একটা ওতপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে। যে সব ব্যবসায় বেশী মূলধন বিনিয়োগের প্রয়োজন অথচ অপেক্ষাকৃত বেশী মুনাফা অর্জিত হয়, সে সব ব্যবসায় এরা বেশী নিয়োজিত। উচ্চ সুদে মহাজনী ঋণ সরবরাহ ও এ গ্রুপের মধ্য থেকে হয়।

৪. ঋণের উৎস ও ব্যবহার :

ইহা সর্বজনবিদিত যে, জমি ও অন্যান্য সম্পত্তি এবং আয়ের স্বল্পতা দেখা দিলে জীবিকা নির্বাহের জন্য অথবা মৌসুমী উৎপাদন লক্ষ্যে ঋণের মুখাপেক্ষী হতে হয় গ্রামের শ্রমজীবী মানুষের একটি গ্রামের জরীপে গ্রামবাসীদের ঋণের উপর যে চিত্র পাওয়া গেছে তা সারণী ৫৮এ দেখা যেতে পারে।

এ সারণী থেকে এটা সুস্পষ্ট গ্রামের প্রায় অর্ধেক পরিবার ঋণগ্রস্থ। পরিবার পিছু ঋণের পরিমাণ হল ১১৪১ টাকা। উৎস অনুযায়ী অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণের উৎসই প্রধান। আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব এবং মহাজন থেকে ঋণ গ্রহণ করা হয় শতকরা প্রায় ৬১·১ ভাগ। জাতীয় পর্যায়ে ৬৫% ঋণ অপ্রতিষ্ঠানিক উৎস থেকে আসে। এদের থেকে অধ্যায়িত গ্রামের তথ্য জাতীয় তথ্যের কাছাকাছি। মহাজন থেকে ১০% ঋণ নেয়া হয়। ব্যাংক থেকে ২৭% নেয়া হয়, সমবায় থেকে এবং ইউ,এস, এইড প্রোগ্রামের অধীনে ০% ঋণ নেয়া হয়। আলোচনা ও পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে, ব্যাংক সিকিউরিটির বিনিময়ে ১৫% সুদে ঋণ দেয়। মহাজনদের ঋণের সুদের হার ১০০% হইতে ২০০% পর্যন্ত ধার্য হয়। উল্লেখ্য যে, সমস্ত পেশা গ্রুপে ব্যাংক হল ঋণের সাধারণ উৎস, কিন্তু জেলেদের বেলায় মহাজনই ঋণ সরবরাহের দাদনের একমাত্র ভরসা। তারা মাছ বিক্রয়ের উপর উচ্চ হারে শুধু কমিশনই ধার্য করে না, উপরন্তু জেলেদের মাছ বিক্রয়ের ব্যাপারে চলাচল ব্যাহত করে। সমবায় ঋণের অধিকাংশ টাকা ব্যবসায়ীদের (৪৩·৫%) এবং চাকুরীজীবিদের (৩৪·৭৮%) নিকট চলে যায়। ইউ,এস,এইড এর ঋণ গ্রহীতা হল ব্যবসায়ী (৬০%) এবং কৃষক (৪০%)। দিন মজুরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের থেকে ঋণ নেয়।

সারণী - ৫

পেশা অনুযায়ী ঋণ উৎস ও ব্যবহার (হারিয়া গ্রাম - ১৯৭৯)

তা বার	পরিবার প্রতি ঋণ (টাকা)	মোট	আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধব	মহাজন	ব্যাংক	সমবায়	ইউ, এস, এইড	কৃষি	জমি পত্তন	জমি ক্রয়	নৌকা ও জাল ক্রয়	খাদ্য ও পরি-বারের খরচ	বাণিজ্যিক পরিবহন ক্রয়	গবাদি পশু ক্রয়	ব্যবসা
০	১৮৯০	১০০	৪৩	৪৪	৩·৩	১৭·৫	১৭·৫	১৮	১৪	১৫	১১	১৯	-	১৫	১২
	২৯৯৮	১০০	৫৩·৭৪	২৪·৯	৪·৮৪	১০·৭৬	৬·৫	৪·৪	৫·৯	৯	৯·৬	৯·০		১১-	৫৩
	৮২২	১০০	৭·৪৫০	৩৩·৯	১৯·৩৭	-	-	৩·৩০	১০·৮	২·৭৭	১৩·৮০	৪১·৬৩		-	২৭·৭
	২৪২০	১০০	৩৩·৯	-	-	৬৬·১	-	-	-	৪৯·৬	-	৩৩·৯	-	-	১৫·৫
	১৫৬৭	১০০	-	১০০	-	-	-	-	-	-	১০০	-	-	-	-
	৩২৯৪	১০০	৭৫·৯	৭·৯	১৬·২	-	-	-	-	-	-	-	১০০	-	-
	৬০০	১০০	১০০	-	-	-	-	-	-	১০০	-	-	-	-	-
১ র	১৯৪১ টাকা	১০০	৪৮·৮১	১৩·১	২৭·১৫	৭৬	৩·৩	১০·৩৫	১·৫	১০·২৮	৪·২৮	১৫·৭৩	৫·৪৬	১১	২৪·৭৮
৩১৫ ঃ	১৪৭১২৫ টাঃ	৩৯৪৫০ টাঃ		৮১৮২০ টাঃ	২৩০০০ টাঃ	১০০০০ টাঃ	৩১২০০ টাঃ	২৮৫৫০ টাঃ	৩৯০৫০ টাঃ	৩১৯০০ টাঃ	৪৭৪২৫ টাঃ	১৬৪৭০ টাঃ	১৬৪৭০ টাঃ	৩৩০০০ টাঃ	৭৩' টাঃ

ঋণের ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে যে, ঋণের বৃহদাংশ ব্যবসায়ে (২৪.৫%) ব্যবহৃত হয়। অবশিষ্টাংশ পারিবারিক প্রয়োজনে এবং খাদ্যদ্রব্য ক্রয়ে (১৫.৭৩%), গরু ছাগল ক্রয়ে (১০.১৫%) জমি পত্তনে (১০.৩%), জমি ক্রয়ে (১০.২৮%) ইত্যাদিতে। ঋণের অর্ধেকেরও বেশী অনুৎপাদনমূলক কাজে ব্যবহৃত হয়। গ্রামে কৃষি প্রধান উপজীবিকা হলেও কৃষিতে মাত্র ১০.৩৩% ঋণ ব্যবহৃত হয়। কৃষকদের ৪৬% ঋণের টাকা কৃষিতে, ১৬% জমি ক্রয়ে, ১২% ব্যবসায় এবং ২৬% খাদ্য ও অন্যান্য পারিবারিক উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হয়। ব্যবসায়ীরা ঋণের টাকা শুধু ব্যবসায়ে (৫৩%) বিনিয়োগ করেনা। তাদের ঋণের ২১% কৃষিতে, ১১% গবাদি পশু ক্রয়ে, ৫% জমি পত্তনে এবং ৪.৫% ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ে ব্যয়িত হয়। মজুর শ্রমিকদের ঋণের অধিকাংশ টাকা খাদ্য ক্রয়েও পারি-বারিক উদ্দেশ্যে (৪২%) ব্যয়িত হয়। এছাড়া দিনমজুররা কৃষিতে (৩.৩২%) জমি পত্তনে (১০.৮%), নৌকা ক্রয়ে (৪১.৬%) এবং খাদ্য ক্রয়েও পারিবারিক খরচে (৩৩.৮%) ঋণের টাকা ব্যবহার করে।

জেলেদের ঋণের টাকা নৌকাও জালক্রয়ে ব্যয়িত হয় এবং ঋণের শর্ত অনুযায়ী তারা দাদনে বাধ্য হয়। মাছবিক্রিরঃ স্বাধীনতা হারানো, মাছ বিক্রির উপর ১২% দৈনিক কমিশন সহ বিভিন্ন ধরনের মানবেতর শোষণের শিকার ঋণগ্রহণকারী এ জেলেরা। পরিবহন কর্মীরা পরিবহন ক্রয় ও মেরামত করা ছাড়া অন্য কোন কাজে ঋণের টাকা ব্যয় করে না। উপরোক্ত আলোচনা থেকে ঋণ ব্যবহারে পেশা ভিত্তিক একটা পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

সবচেয়ে বেশী ঋণ নেয় কৃষকেরা, অথচ পরিবার পিছু ঋণের পরিমাণ চাকুরীজীবি ও ব্যবসায়ীদের চেয়েই ইহা অনেক কম। কারণ ঋণ নেওয়ার জন্য কৃষকদের সিকিউরিটি দেওয়ার ক্ষমতা অনেক কম। একই কারণে দিনমজুরের পরিবার পিছু ঋণ সবচেয়ে কম। বর্তমান ব্যাংকিং ব্যবস্থায় বিত্তহীনদের ঋণ নেওয়ার সুযোগ নেই বললেই চলে। কারণ বন্ধক হিসেবে দেয়ার স্থাবর সম্পত্তি ওদের নেই। অতএব উক্ত সর্বহারাকে ওদের লাভবান করতে হলে ভূমি সংস্কারের সাথে ঋণ নীতির সংস্কারও প্রয়োজন, যাতে করে বিত্তহীন শ্রমজীবি মানুষ ও ঋণের সুবিধে ভোগ করে জীবনযাত্রার মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করতে পারে।

৫. শিক্ষার অবস্থা ঃ

বৈদ্যের বাজার ইউনিয়নের এই ৭টি গ্রামের ছেলেমেয়েরা দুটো প্রাইমারী স্কুল এবং একটি পাইলট হাইস্কুলের সুবিধা ভোগ করা সত্ত্বেও এখানে শিক্ষিতের হার খুবই কম। এ গ্রামগুলোর ৬১৩ জন পরিবার প্রধানের শিক্ষাগত তথ্য বিশ্লেষণ করলে এ ব্যাপারে কিছু ধারনা পাওয়া যেতে পারে। অর্ধেকের চেয়ে বেশী (৫১·৩৮%) পরিবার প্রধান একেবারেই নিরক্ষর, এ অর্থে যে তাদের কোন অক্ষরজ্ঞান নেই। এমনও অনেক গ্রাম আছে যে, পরিবার প্রধানদের নিরক্ষরের সংখ্যা ৭৫% এরও অধিক। ১৯৭৪ সনের সংজ্ঞা অনুসারে যে পড়তে, লিখতে ও চিঠিপত্র বোঝে তাকে অক্ষরজ্ঞান সম্পূর্ণ বিবেচনা করলে এ সব গ্রামে প্রায় শতকরা ৭৪ ভাগ পরিবার প্রধানকে নিরক্ষর অভিহিত করা যায়, কারণ প্রাইমারী পাশ ছাড়া পূর্ণভাবে পড়তে, লিখতে ও পড়ে বুঝতে খুব কম লোকই এ গ্রাম দেশে। পরিবার সদস্যদের শিক্ষার মানগত অবস্থা আরও শোচনীয়।

৪০০১ জনের এ সাতটি গ্রামে ৩৪২০ জন লোক ৫ বৎসরের উপরে। এদের মধ্যে হিসেব করে দেখা গেছে যে, ২০৭১ জন অর্থাৎ ৬১% লোক একেবারে নিরক্ষর। (১২) ১৩% লোক নিরক্ষরতা মুক্ত, ১৬% প্রাইমারী পাশ করেছে, ২% লোক এস,এস,সি পাশ, মাত্র ৫% ডিগ্রী পাশ এবং আর বাকী ৭·৫% অধ্যায়ন রত। অধ্যায়নরতদের মধ্যে ৬৮% প্রাইমারীতে, ২৮% হাইস্কুলে এবং ৪% কলেজে পড়ছে। অধ্যায়নরত ছাত্র সংখ্যা ৬ থেকে ২৫ বছর বয়সের ১২৩৩ জন লোকের ১৩%। এ এলাকায় প্রাইমারী স্কুল, হাইস্কুল এবং ডিগ্রী কলেজ থাকা সত্ত্বেও শিক্ষার নিতান্ত কম হারের প্রধান কারণ হল এযে, অধিকাংশ পরিবারের আর্থিক দুর্দশা এবং হুদে ব্যবসা ও কিছু কাজ কর্ম করে অল্প বয়স থেকে উপার্জন করার সুযোগ এবং শিক্ষিত বেকারের আধিক্য রয়েছে। এলাকায়। মেয়েদের শিক্ষার হার নিতান্ত কম হওয়ার কারণ মেয়েদের বিয়ে দেয়ার দিকেই সবার ঝোঁক। একটু উপার্জন করার মত বয়স হলে ছেলেদের পড়াশুনা বন্ধ করে দেয়া হয়। এ ধরনের অবস্থায় শিক্ষামূলক যে কোন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে খুবই জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে এ কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, শিক্ষার মানের সাথে আয় এবং জমি মালিকানার একটা সম্পর্ক রয়েছে। একটি গ্রামের ৩১৯টি পরিবারের তথ্য ভিত্তিতে জমি মালিকানার সাথে শিক্ষামানের সম্পর্ক পরবর্তী পাতায় দেওয়া হল ঃ

৫ বছরের উপরে ৫১% লোক ভূমিহীন পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। আর ভূমিহীন লোকদের ৬০% একেবারেই নিরক্ষর, ১৯% ৫ম শ্রেণীর নীচে, ·১% ৫ম সমাপ্ত, ৩·৫% ৮ম সমাপ্ত এবং মাত্র ৬·৬% এস, এস, সি পাশ। ভূমিহীনের গ্রুপ হইতে ২ একর জমির মালিকের গ্রুপ পর্যন্ত নিরক্ষরের সংখ্যা ৬০%'র অধিক। অথচ ৪ একরের উর্ধ্বে জমির মালিকদের পরিবারের কোন পুরুষ নিরক্ষর নেই এবং মহিলা নিরক্ষর যারা রয়েছে তাও অপেক্ষাকৃত অনেক কম। ৫ একরের উর্ধ্বে জমির মালিক পরিবারের ৫ বছরের উর্ধ্বে সদস্য সংখ্যা ৩১ এবং এস, এস, সি সমাপ্ত শিক্ষামানের লোক সংখ্যা ৫ জন অর্থাৎ ১৬%। অথচ ০·১-০·৫ একর জমির মালিকদের ৩২৫ জনের মধ্যে এস, এস, সি সমাপ্ত শিক্ষা-মানের লোক সংখ্যা ৫ জন অর্থাৎ ১·৫%। যার অর্থ হল প্রথমোক্ত গ্রুপে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন মান শেষোক্তর চেয়ে ১০ গুণ বেশী। এভাবে আলোচনা করলে শিক্ষামানের সাথে পরিবারের জমি মালিকানার অবস্থার একটা সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যাবে।

সারণী-৬

শিক্ষার মান ও জমির মালিকানা সম্পর্ক (হারিয়া গ্রাম)

...জন	গ্রামের মোট পারিবারিক সদস্য ৫ বছরের উপরে (সংখ্যায়)	শতকরা ভাগে							
		নিরক্ষর	পঞ্চম শ্রেণীর নীচে	৫ম শ্রেণী সমাপ্ত	৮ম শ্রেণী সমাপ্ত	এস, এস, সি সমাপ্ত	এইচ, এস, সি সমাপ্ত	ডিগ্রী সমাপ্ত	মোট
	৮৬১	৬৬ (৫৫)	১৯ (৫৫)	৮ (৫৪)	৪ (৫৬)	১.১ (৪৩)	১ (৫৬)	.১০ (১২)	১০০ (৫৪)
	৩২৫	৭৪ (২৩)	১৫ (১৬)	৭ (১৮)	২ (১১)	.৬ (৬)	.৩ (৬)	১ (৩৮)	১০০ (২০)
০	১৬২	৬৪ (১১)	১৯ (১০)	৮ (৯)	২ (৭)	৪ (১৯)	২ (১৯)	১ (২৫)	১০০ (১১)
০০	১১৮	৬৩ (৭)	১৯ (৮)	১৬ (৯)	৫ (১০)	১ (৩)	.৫ (৬)	.৫ (১২)	১০০ (৮)
০০	১৯	৬৩ (১.১)	২১ (১)	৫ (১)	০	১১ (৬)	০	০	১০০ (১)
০০	৪৮	৫৩ (২.২)	৩৯ (৫)	১৫ (৬)	২ (২)	২ (৩)	০	০	১০০ (৩)
০০	১৪	২১ (.৩)	২১ (১)	১৪ (২)	৭ (২)	২৯ (১৩)	০	০	১০০ (১)
	৩১	১৩ (৪)	৪২ (৪)	৩ (১)	২৭ (১২৩)	৬ (৬)	৬ (১৩)	৩ (১৩)	১০০ (২)
...হার		৬৫.৫ (১০০)	১৯ (১০০)	৮ (১০০)	৪ (১০০)	২ (১০০)	১ (১০০)	.৬ (১০০)	১০০

...রিক সদস্য=১৫৭৮
...উপরে)

...বন্ধনীর ভেতর শতকরা হার সুস্তাকারে এবং বন্ধনীর বাইরে শতকরা ভাগ সারিবদ্ধভাবে সাজানো হয়েছে।

শিক্ষামানের সাথে আয়ের একটি সম্পর্ক নিম্নে দেয়া যেতে পারে।

সারণী - ৭

শিক্ষামান ও আয়

পরিবারের আয়ের মান	লোক সংখ্যা	আয় অনুসারে শিক্ষামানের গ্রুপগুলো (শতকরা হিসেবে)							আয়ের গ্রুপগুলোর শিক্ষামানের স্কোর
		নিরক্ষর	৫ম শ্রেণীর নীচে	৫ম সমাপ্ত	৮ম সমাপ্ত	এস, এস, সি,	ইন্টার-মিডিয়েট	ডিগ্রী	
ক	৪০৯	৯০·২২	৬·৩৫	২·৪০	·৭৩	·২৪৫	-	-	·৪৮৪
খ	৯২২	৭০·৯	১৭·১৩	৭·৩৭	২·৬০	১·৪৯	·৪৯	-	১·৫৫
গ	৩৩০	৫৭·৮৯	২৩·৬৩	১১·২৯	১·৭৬	২৪·২৬	৩·১৪	০·৬৪	২·৩৫
ঘ	১৩৬	৩৫·৬১	১৪·৪৫	১০·৭৫	৯·৮৫	৮·১৮	৫·৯২	২·২৪	৪·৯৪
ঙ	২৩৭	৪৫·৫৭	২৯·৫৪	১০·১৪	৮·০২	২৯৫	২·৫২	১·২৬	৩·৩৯

উপরের সারণী থেকে স্পষ্ট যে, নিম্ন আয়ের পরিবারে ৯০%'রও বেশী লোক নিরক্ষর। আর 'ঘ' ও 'ঙ' আয়ের গ্রুপে নিরক্ষরের সংখ্যা ৩৫-৪৫%'র মধ্যে। 'ক' গ্রুপে ৫ম শ্রেণী সমাপ্তের সংখ্যা ২·৩৩%, অথচ 'গ' 'ঘ' ও 'ঙ' গ্রুপে এ সংখ্যা যথাক্রমে ১১·২৯%, ১০·৭৫% এবং ১০·১৪%। নিম্ন আয়ের 'ক' গ্রুপে ·২৪৫% লোক এস, এস, সি পাশ, অথচ 'ঘ' ও 'ঙ' গ্রুপে এ সংখ্যা ৭·৪৪% ও ২·৫৩। এসব তথ্য আয়ের সাথে শিক্ষামানের অবস্থার একটা ওতপ্রোত সম্পর্কের ইংগিত দেয়, শিক্ষামানকে স্কোর করে আয়ের সাথে যে সম্পর্ক দেখানো হয়েছে তাতে দেখা গেছে যে, 'ক' আয়ের গ্রুপে স্কোর মাত্র ·৪৮৪, অথচ 'ঘ' ও 'ঙ' আয়ের গ্রুপে ইহা যথাক্রমে ৪·৯৪ এবং ৩·৩৯।

তবে এটাও সত্য যে, উপরের আয়ের গ্রুপের মধ্যে শিক্ষার সাথে আয়ের সরাসরি নয় যার অর্থ হল উচ্চ মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের জন্য শিক্ষা শুধু আয়ের উপর নির্ভরশীল নয়, পারিবারিক ঐতিহ্য, পেশার ধরণ এবং আরো অন্যান্য বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। পর্যবেক্ষন করলে দেখা যাবে যে, কৃষির তুলনায় অকৃষি পেশায় নিয়োজিত পরিবারগুলোর শিক্ষার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব রয়েছে। এটার কারণ এযে, অকৃষি খাতে নিয়োজিত থাকার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়, সেগুলোর জন্য কিছু লেখাপড়া প্রয়োজন, যার ফলে প্রয়োজনের খাতিরে এসব পেশার পরিবারগুলো ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার দিকে বেশী নজর দেয়।

তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, পরিবারগুলোর একটা বৃহদাংশ (প্রায় $\frac{১}{৩}$) একেবারেই নিরক্ষর (যেখানে একজনও অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন নয়)। নিম্নে নিরক্ষর পরিবারগুলোর বৈশিষ্ট আলোচনা করা হলো।

সারণী - ৮

নিরক্ষর পরিবারগুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট
(হারিয়া গ্রাম)

য়	পরি-বারের সংখ্যা	পরিবার প্রধানের প্রধান পেশা							নিজস্ব মালিকানাধীন ঘরের জমি				
		কৃষি	ব্যবসা	দিন মজুরী	চাকুরী	মাছধরা	শিল্প	অন্যান্য	০	০·১-০·৩৩	·৩৪-·৫০	·৫১-১·০০	১·০১-২·০০
৪২		৪৫ (৩৮)	৫ (১৫)	৪৬ (৫১)			২ (১০০)	২ (১০০)	৭১ (১৬)	১৯ (২৯)	৫ (৩৩)	২ (১৬)	৩ (২৫)
৫৭		৪৭ (৫৪)	১৪ (৬২)	৩০ (৪৬)	৪ (১০০)	৩ (৬০)			৫১ (৪৪)	৩০ (৬১)	৭ (৬৯)	৯ (৪৩)	৩ (৫০)
৮		৫০ (৮)	২৫ (১৬)	১২ (৩)		১২ (২০)			৪৯ (৬)	৩৯ (১০)			১২ (২৫)
১						১০০ (২০)			১০০ (২)				
১			১০০ (৮)						১০০ (২)				
ট	১০০ (১০০)	৪৭ (১০০)	১১ (১০০)	৩৩ (১০০)	২ (১০০)	৫ (১০০)	১ (১০০)	১ (১০০)	৬০ (১০০)	২৬ (১০০)	৬ (১০০)	৫ (১০০)	৩ (১০০)
ট বার প্রধান খ্যা	১০৯	৫০	১৩	৩৭	২	৫	১	১	৬৫	২৮	৬	৬	৪

বঃদ্রঃ সারণীতে প্রথম বন্ধনীর বাইরে সারিবদ্ধ শতকরা হার এবং বন্ধনীর ভেতর সুস্তাকারে শতকরা ভাগ দেখানো হয়েছে।

উপরের সারণী থেকে এটা স্পষ্ট যে, ১০৯টি নিরক্ষর পরিবারের ১১টি পরিবার নিম্ন এবং নিম্নবিত্ত আয়ের পরিবারের। অবশিষ্টদের ১০টি পরিবার মধ্যবিত্ত।

অভিজ্ঞতা থেকে জানা গেছে যে, দরিদ্র পরিবারগুলোর কিছু পড়াশুনার পর তাদের কর্ম-সংস্থান অপরিহার্য হয়ে পড়বে, যার কোন ব্যবস্থা না করতে পারলে শিক্ষা উন্নয়নে আবার ভাটা পড়বে। শিক্ষার উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট থাকতে হবে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সাথে সরাসরি সম্পর্ক না রাখতে পারলে শিক্ষা কর্মসূচী জনগণের নিকট আকর্ষণের বিষয় হয়ে উঠবে না। তখন গ্রাম্য প্রবচনই মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। "লিখিব পড়িব থাকিব দুঃখে, মৎস্য ধরিব, খাইব সুখে"। নিরক্ষর পরিবারগুলোর মহিলাদের শিক্ষার ব্যবস্থা সর্বাগ্রে করা উচিৎ। এজন্য যে, বাচ্চাদের পড়াশুনা নির্ভর করছে মায়ের শিক্ষার মান এবং শিক্ষার প্রতি আগ্রহের উপর। মহিলারা কিছু অবসর সময় শিক্ষার জন্য ব্যয় করলে পরিবারের আর্থিক কোন ক্ষতি হবে না। শিক্ষিত পরিবারের সাথে সম্পর্ক অনেক সময় সম্ভব হয়ে উঠেনা আর্থ-সামাজিক কারণে। না হলে, সেটাও শিক্ষার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা হতে পারত।

সার্বজনীন শিক্ষার জন্য সবচেয়ে যা বেশী প্রয়োজনীয় মনে হয়েছে, সেটা হলো সবার ছেলে-মেয়েদের খাদ্য ও জামাকাপড়ের নিশ্চয়তা প্রদান এবং লেখাপড়া শেখার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং পর্যাপ্ত শিক্ষক। শত সমস্যা সত্ত্বেও নিরক্ষরতার মত ব্যাধি থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেশকে মুক্ত হতে হবে। শিক্ষার ব্যবহিত ফল দেখা সম্ভব না হলেও শিক্ষার মান বৃদ্ধির সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটা ওতপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে এবং শিক্ষার ফল সুদূরপ্রসারী। শুধু নির্দিষ্ট উন্নয়নের পর্যায়ে প্রযোজ্য শিক্ষা সূচীর উপর আলোচনা হতে পারে। পেশাগত দিক থেকে এ নিরক্ষর পরিবারগুলোর প্রায় অর্ধেকেই (১০১টি পরিবারের ৫০টি) কৃষিতে এবং $\frac{১}{৩}$ ভাগ দিন মজুরীতে নিয়োজিত। স্কুল যাওয়ার বয়সে এ নিরক্ষর পরিবারগুলোর ছেলেমেয়েরা কৃষিকাজে সাহায্য করে অথবা ছোটখাটো উপার্জন কাজে নিয়োজিত এবং নিম্ন আয়হেতু স্কুলে পড়ার সংস্থান করতে অসুবিধে হয়। ক্ষুদে ব্যবসায়ীদের মধ্যেও কিছু নিরক্ষর পরিবার রয়েছে। অতএব পেশার সাথে নিরক্ষরতার একটা ওতপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে।

জমির মালিকানার সাথে আয়ের সম্পর্ক নির্ণয় করলে দেখা যাবে যে, প্রায় ৫৯% নিরক্ষর পরিবার ভূমিহীন। অতএব ভূমিহীনতা এবং আয়ের স্বল্পতার সাথে নিরক্ষরতার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণ করলে প্রতিয়মান হয় যে, আয় ও জমির স্বল্পতা, ভূমিহীনতা, অল্প আয়ের পেশা নিরক্ষর পরিবারগুলোর সাথে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাধা। অতএব, নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন পরি-কল্পনায় দরিদ্র, ভূমিহীন, ক্ষুদে জমির মালিকদের ছেলেমেয়েদের যথাযথ সাহায্য ও সহানুভূতি

প্রদর্শন না করলে বিশেষ ফল পাওয়া যাবেনা বলে ধরে নেয়া যায়। নিরক্ষর পরিবারগুলোর লেখাপড়ার ঐতিহ্যের অভাবের জের টেনে এনে পারিবারিক ঐতিহ্যকে নিরক্ষতার মূল কারণহিসেবে চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু পারিবারিক ঐতিহ্যও যে বংশানুক্রমে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার ফসল। অতএব যেভাবেই বিচার করি না কেন বাস্তবসতার প্রেক্ষাপটে সার্বজনীন শিক্ষার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক দুর্দশা লাঘবকে প্রধান কাজ বলে বিবেচনা করতে হবে।

৬. আয় ও জীবনযাত্রার মান এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিন্যাস কাঠামোঃ

আয়ের মান অনুযায়ী পরিবারগুলোকে সাজালে দেখা যাবে যে, গ্রামের অধিকাংশ পরিবারই নিম্ন আয় মানের। হারিয়া গ্রামের জরীপ অনুযায়ী নিম্ন এবং নিম্ন মধ্য আয়মানের পরিবারগুলো মোট পরিবারগুলোর ৭১% এবং মোট লোকসংখ্যার ৬৫% উচ্চ আয়মান মাত্র ১৮% লোকসংখ্যার ১৪% পরিবার অবস্থান করছে। ৮০·৭৫% পরিবারের কোন উদ্বৃত্ত নেই এবং কোন মতে সমান আয় ব্যয় অথবা ঘাটতি ও ঋণের মধ্য দিয়ে জীবন চালাচ্ছে। ১ জনের আয়ের উপর ২·৭৬ জন নির্ভর করে। এ সংখ্যা জাতীয় মানের কাছাকাছি, যেখানে ৮০% লোক দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে। অনেক গ্রামে খুব কম পরিবারই রয়েছে যাদের উদ্বৃত্তও রয়েছে। গ্রামগুলোতে অধিকাংশ লোকের ফসলের মৌসুমে কোন ভাবে চলে, কিন্তু মৌসুম চলে যাবার পর ধার অথবা সঞ্চয় ভেংগে অথবা যা ঘরে থাকে তা বিক্রি করে সংসার চালায়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, যেসব পরিবারে কর্মক্ষম পুরুষ লোক বেশী সে সব পরিবারের আয়ক্ষমতাও বেশী। কর্মক্ষম মেয়েদের উপার্জনশীল কোন কাজে লাগানোর উপযুক্ত সুযোগের অভাব ও সামাজিক বাধা অনেক মহিলা সদস্যের উপস্থিতি পরিবারের জীবনযাত্রার মান নীচু করতে বাধ্য হচ্ছে। কৃষি জমির পরিমাণ ও জমির উৎপাদন ক্ষমতার উপর আয়ের মান বহুলাংশে নির্ভর করে। এ ছাড়া পেশার লাভজনকতাও আয়ের উপর বিপুল প্রভাববিস্তার করে।

যাদের পুঁজি ও জমি দুইই আছে, তাদের অবস্থা আপেক্ষিকভাবে ভাল। যারা এ' এলাকায় মূলী বাঁশের ব্যবসা, মাছের আড়তদারী করছে এবং জমিতে কপি, আখ ও করলা লাগিয়ে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কৃষি কাজ করছে তাদের আয়ের মান সর্বোচ্চ। গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, দারিদ্র্যই অধিকতর দারিদ্র্যের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আর্থিক অনটনে পড়ে লাভজনক কাজে নিয়োজিত হওয়ার জন্যই পুঁজি ও সম্পদ নেই অনেকের। এমনকি হাঁস -মুরগী পালনে খাদ্য, বেড়া ও অন্যান্য

আনুসাংগিক জিনিষপত্র পর্যন্ত যোগাড়ের সামর্থ নেই, টাকাও ভূমির অভাবে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও গবাদি পশু পালন করতে পারছে না। চাষাবাদের জন্য খরচ বহন করতে পারছে না অথবা ধার যোগাড় করতে পারছে না বিধায় পতনে ও জমি নেয়ার সুযোগ নেই। অথচ গতর খাটানোকের অধিকাংশই এ পর্যায়ের জীবনের অধিকারী। উৎপাদনের জন্য আনুষংগিক উপকরণ ওদের নেই। ফলে নিজের শ্রমকে যথাযথ ব্যবহার করে উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধির সুযোগ এরা পাচ্ছেনা। হারিয়া গ্রামের তথ্যের ভিত্তিতে আয়ের মানের সাথে কর্মে অংশগ্রহণের হার, পরিবারের আকার, মাথাপিছু জমি ও অন্যান্য সম্পত্তি মালিকানা এবং পরিবারের শিক্ষার মানের একটা সম্পর্ক দেখা যেতে পারে।

সারণী - ৯

কর্মে নিয়োগের হার, পরিবারের আকার, মাথাপিছু জমিও অন্যান্য সম্পত্তির মালিকানা এবং পরিবারের শিক্ষার সাথে আয় মানের সম্পর্ক (হারিয়া গ্রাম)

আয়ের গ্রুপ	পরিবারের সংখ্যা	সম্পদের মোট সংখ্যা	পরিবারের গড় আকার	পরিবারের লোক-সংখ্যার উপার্জনকারী কর্মে নিয়োগের হার	পরিবারের উপার্জনকারী গড় সদস্য সংখ্যা	মাথা পিছু জমি মালিকানা		মাথাপিছু অন্যান্য সম্পত্তির মালিকানার পরিমাণ	পরিবারের গড় শিক্ষা
						মালিকানাধীন চাষের জমি (একরে)	মোট চাষের জমি (একরে)		
ক	৭২	৪০৯	৫·৬৮	·২৩	১·৩৩	·০২	·০৫	৮৯·৭	·৪৮৪
খ	১৫৪	৯২২	৫·৯৯	·২৬৭	১·৫৯	·০৪	·০৯৮	২৮৭·৮৯	১·৫৫
গ	৪৭	৩০০	৭·০২	·২৯২	১·৯১	·০৭৬	·১৩	৯৯৪	২·৩৪
ঘ	১৬	১০৬	৮·৫	·৩১	২·৬২৫	·২০৬	·১৪৫	৩০৫১·৪	৪·৯৪
ঙ	৩০	২০৭	৭·৯	·২৭	২·১০৩	·২২৬	·১৪	৬২৯৬·৫	৩·৩৪
মোট গড় =	৩১৯	২০০৪	৬·৩৭৬	০·২৬৫	১·৬৪	·০৮	·১০১	৯৩১·২	১·৭৬

অপর পৃষ্ঠার সারণী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পরিবারের আয়ের মানের সাথে কর্মে অংশগ্রহণের হার, মাথাপিছু জমি ও অন্যান্য সম্পত্তির মালিকানা এবং পরিবারের শিক্ষামানের একটা ওতপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে। উচ্চ আয় মানের গ্রুপের মাথাপিছু জমি মালিকানা উচ্চ নাও হতে পারে।

এটা হতে পারে এজন্য যে, উচ্চ আয়মানের পরিবারগুলোর ব্যবসার দিকে ঝুঁকে পড়েছে। কারো কারোর কৃষিটা একটা উপপেশা মাত্র। এটা যে কিছুটা সত্য এর প্রমাণ হল, উচ্চতম আয় গ্রুপের মাথাপিছু অভূমি সম্পত্তি (পুঁজিসহ) সবচেয়ে বেশী এবং পূর্বের গ্রুপের দ্বিগুণ। উচ্চতর আয়মানের পরিবারগুলোর ৫৩% ব্যবসায় নিয়োজিত। আয়ের মান পরিবারের উপার্জন কর্মে অংশগ্রহণের হারের উপরও নির্ভরশীল। নিম্নতম আয় গ্রুপের উপার্জনকারী গড় সদস্য হল মাত্র ১·৩৩% এবং উপার্জনে অংশগ্রহণের হার হল ২৩%। অপরপক্ষে উচ্চতম আয় গ্রুপের উপার্জনে অংশ গ্রহনের হার হল ২৭% এবং উপার্জনকারী পরিবার সদস্য হল ২·১৩। জমির মালিকানা উচ্চতর আয়ের সবচেয়ে বেশী। এর কারণ তারা তাদের আয় দ্বারা জমির পরিমাণ (ক্রয়ের মাধ্যমে) উত্তরোত্তর বৃদ্ধির ক্ষমতা রাখে।

হিসেবে দেখা গেছে যে, আয়মানের সাথে উপার্জনকর্মে অংশগ্রহনের হার, মাথাপিছু জমির পরিমান, মাথাপিছু অভূমি সম্পত্তি এবং শিক্ষার সারিপার্থক্য সম্পর্ক সহগ যথাক্রমে ·৭৫, ·৯০, ১·০০ এবং ·৯০। এর অর্থ হল আয়মান বৃদ্ধির উপর মাথাপিছু জমির পরিমাণ, পুঁজিসহ অভূমি সম্পত্তি, শিক্ষামান এবং পেশাগত ধরন সমান প্রভাব বিস্তার করে।[১৪] লেখচিত্র - ১ থেকে স্পষ্ট যে,[১৫] আয়ের সাথে সরাসরি সম্পর্ক শুধু মাথাপিছু অভূমি সম্পদ মালিকানার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পরিবারে শিক্ষার সাথে ইতিবাচক সম্পর্ক থাকলেও উচ্চ আয় বিশিষ্ট পরিবারে শিক্ষা উচ্চ নাও থাকতে পারে। এর কারণ, পরিশ্রম করে মধ্যম আয়গ্রুপের লোকেরাও শিক্ষার উচ্চমান অর্জন করতে পারে এবং এ ব্যাপারে তারা অধিকতর সচেষ্টও। শিক্ষা আয় বাড়ানোর একটি মাধ্যম। যারা উচ্চ আয় গ্রুপে উত্তরিত হতে চায় তাদের শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব অত্যধিক। আয়মানের সাথে উপার্জনে অংশ গ্রহণের হারের সম্পর্কও ঘনিষ্ঠ। তবে পেশাগত লাভজনকতাও সম্পদ মালিকানার তারতম্যের ফলে এ সম্পর্ক সরাসরি হয়ে উঠতে পারেনা। মাথাপিছু জমির সাথে আয়মানের ওতপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে।

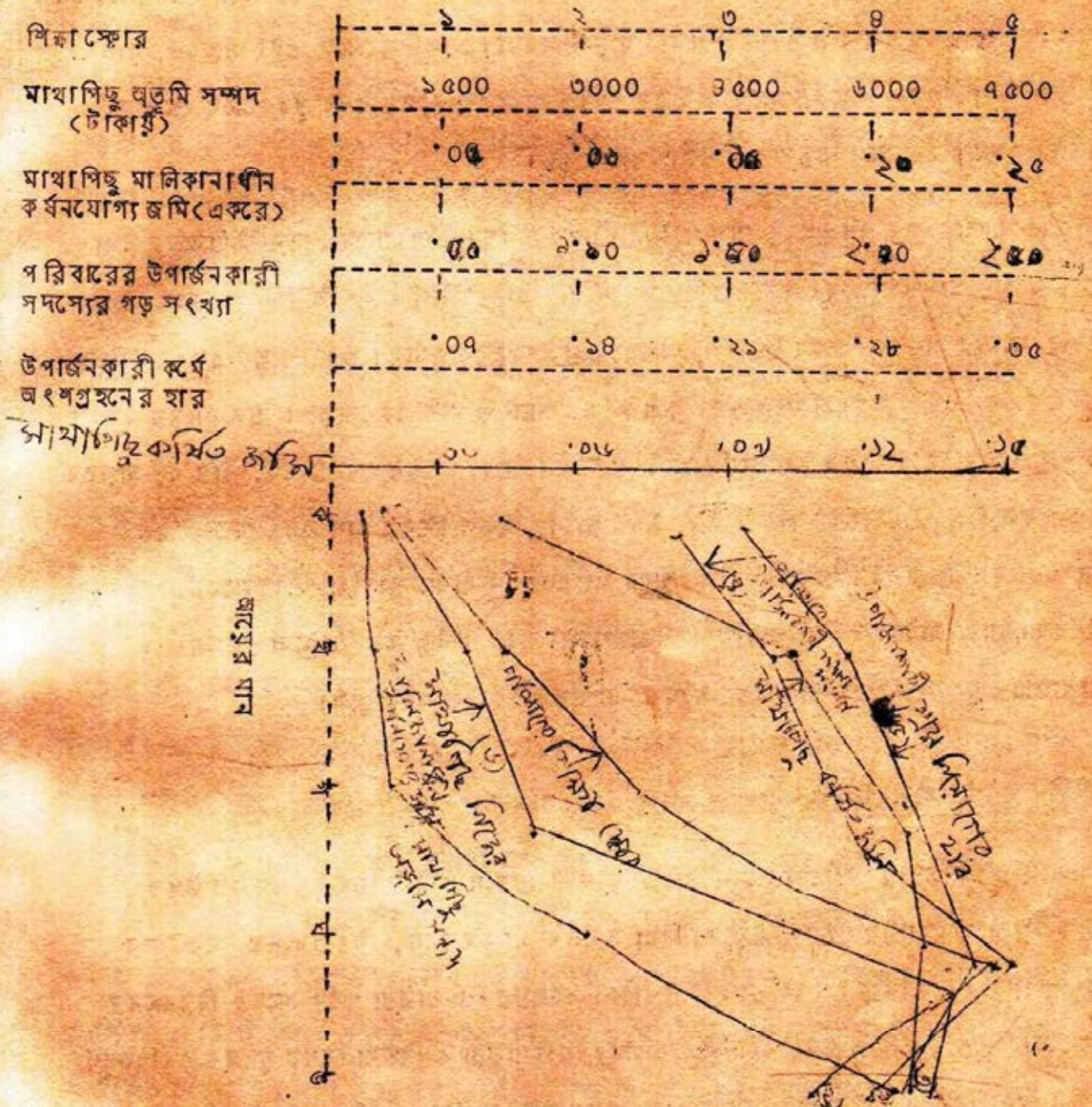

লেখ চিত্র - ১
আয়মানের সঙ্গে শিক্ষা, মাথাপিছু ভূমি ও জমি সম্পদ, পরিবারের উপার্জনকারী সদস্য সংখ্যা এবং উপার্জনকারী শ্রমে অংশগ্রহনের হারের সম্পর্ক।

কিন্তু তবুও অতূমি সম্পদের পরিমানগত প্রার্থক্য পেশাগত লাভজনকতা এবং উপার্জনকারী প্রতি নিয়োগের হারের তার তম্যের দরুন এ সম্পর্ক সরাসরি হয়ে উঠছেনা। লেখচিত্র থেকে এটা স্পষ্টযে, উচ্চ আয় গ্রুপেই কার্য করণ সম্পর্কের মাঝে ব্যতিক্রমধর্মী প্রবণতা দেখা দেয় যখন পৃথকভাবে প্রত্যেকটি কারণগত উপাদানের সাথে আয়মান সম্পর্ক দেখানো হয়।

জীবনযাত্রার মান শুধু আয়ের মাপকাঠিতে সীমাবদ্ধ নয়। জীবনযাত্রার মান নির্ধারনের জন্য খোয়া, থাকা, বাসস্থান এবং জীবনযাত্রার পদ্ধতিগত বিভিন্ন নির্দেশকের বিশ্লেষণ প্রয়োজন। ৯% পরিবার অন্যের বাড়ীতে থাকে। ৩৬% পরিবারের লোক মাটিতে ঘুমায়। ৩৭% মেঝে এবং চৌকিতে উভয়ভাবে এবং ৩৬% শুধু চৌকিতে এবং মাত্র ১'৫% খাটে ও পালংকে শোয়: । বাসস্থানের অবস্থা এতই নাজুক যে, গড়ে ৬'৪৭ সদস্যের প্রত্যেক পরিবারের জন্য ১'৩৫ ঘর রয়েছে, যার গড় আয়তন মাত্র ৩৫ বর্গফুট , ৯৪% ঘরের কাঁচা মেঝে, ৬১% থাকার ঘরের টিনের ছাদ এবং মাত্র ০'৪৬% ঘরের পাকা ছাদ রয়েছে।[১৬] বেশীর ভাগই সুদূর অতীতের স্মৃতিবাহক। ২৩% পরিবারের কোন রান্না ঘরই নেই। তারা বাইরে অথবা অন্যের পাকঘরে রান্নার কাজ সম্পন্ন করে। এগুলো গ্রামের জনসাধারণের দুরবস্থা এবং মানবেতর জীবন যাপনের ইংগিত বহন করে।

রাজনৈতিক ও সামাজিক নিয়ন্ত্রনঃ

এলাকায় দারিদ্র্যের আধিক্যের ফলে মুষ্টিমেয় ধনীলোকদের বিভিন্নভাবে জনগণের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, বিত্তবানদের হাতেই সব ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ। স্থানীয় জনগণ এমন কি উপজিলা পর্যায়ের অফিসাররা পর্যন্ত তাদের নিয়ন্ত্রনের বাইরে কোন কাজ করতে পারছেন না। ফলে সরকারী অফিসাররা এ বিত্তশালীদের স্বার্থের সংগতিপূর্ণ কাজ করে চাকুরী জীবন অতিবাহিত করছেন। জনগণের স্বার্থে সেটা ভাল হউক বা মন্দ হউক। পর্যালোচনা করে দেখা যাবে যে, বিভিন্ন সমবায়ের ম্যানেজার, বি, আর, ডি, পি'র সভাপতি, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, বিভিন্ন ক্লাবের প্রেসিডেন্ট অথবা সেক্রেটারী সবাই উচ্চ আয়মানের এবং তাদের উপর নির্ভর করছে কিভাবে বিষয়গুলো চক্রায়িত হবে। পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে, এ'এলাকার ক্ষমতার বলয়ে অধিষ্ঠিত পূর্বতন চেয়ারম্যান এবং বর্তমান চেয়ারম্যান এর গড়ে ৯ একর জমি, যদিও এ গ্রামগুলোর পারিবারিক গড় জমির পরিমাণ '৪৮ একরের বেশী নয়।

এদের পরিবারের সদস্যরা প্রায়ই কায়িক শ্রম থেকে বিরত, চাষ বাসের কাজ এবং মুজুর শ্রম [illegible] ও কর্মচারী দ্বারা সম্পন্ন করে। এলাকায় অধিক লাভজনক ব্যবসা হিসেবে পরিচিত মুলীবাঁশের ব্যবসা এবং মাছের আড়তদারীর নিয়ন্ত্রণ এদেরই হাতে। অতএব অর্থনৈতিক শক্তির স্বার্থে রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের যে একটা ওতপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে এটা এখানে সুস্পষ্ট। ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণকারী এ মুষ্টিমেয় বিত্তশালীলোকের ইচ্ছার উপর কোন সংগঠন অথবা থানা পর্যায়ের কোন বিভাগের কাজের অগ্রগতি নির্ভর করে। কৃষি সমবায়, জেলে সমবায়, তাঁতী সমবায় এবং এমন কি মহিলা সমবায় সমিতিতেও সদস্যের অর্থনৈতিক শক্তি এবং ক্ষমতার দাপটেই প্রবেশ অনুমতির জন্য বিরাট মানদন্ড হিসাবে কাজ করে এবং এরা সদস্য না হলেও সমিতিগুলোর কর্মের অগ্রগতিতে এদের প্রভাব অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, ব্যবসায়ী সমিতিতে অন্য কোন পেশার লোক নির্বাহী সদস্য অথবা সেক্রেটারী হিসেবে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। অথচ, ব্যবসায়ীরা কৃষি সমবায় সমিতি, জেলে সমিতি, ভূমিহীন সমিতি ইত্যাদিতে নির্বাহী সদস্য অথবা সেক্রেটারী . কাজ করতে দেখা যায়। ভূমিহীন সমিতিতে ১২ জন নির্বাহী কমিটির সদস্যের মধ্যে ৩জন মাত্র ভূমিহীন, আর সবাই ব্যবসায়ী অথবা কৃষক হিসেবে পরিচিত। বিভিন্ন কৃষি সমিতিতে নিয়ন্ত্রণ ও উল্লেখযোগ্য ভাগ দখল করে আছে ব্যবসায়ীরা, ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন সমিতিতে ভাগ বসানোর প্রধান উদ্দেশ্যে হল সমিতির মাধ্যমে ঋণের সুবিধে ভোগ করা এবং দ্বিতীয়তঃ তাদের স্থানীয় নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এবং সম্মান বৃদ্ধি করা। ফলে সমবায় সমিতিগুলো নিজস্ব স্বার্থে স্বাধীনভাবে গড়ে উঠতে পারছেনা। অসম সম্পদ মালিকানা জনিত শ্রেণী বৈষম্যের সামাজিক অবস্থায় স্বনির্ভর আন্দোলন, সমবায় এবং জনগণের প্রশাসনে অংশগ্রহণের কোন প্রচেষ্টা গ্রহণ কালে এ' ধরনের অসুবিধা 'এশিয়ান নাট্যমঞ্চে'র রচয়িতা গুনার মির্ডাল ও প্রত্যক্ষ [17] করেছেন নিজের গবেষণা কাজে। বস্তুতঃ বিরাজমান আর্থ-সামাজিক কাঠামোকে বাদ দিয়ে উন্নয়ন চিন্তা, মূল বিষয়কে বাদ দিয়ে চিন্তার সামিল।

৭. সারসংক্ষেপ ও উপসংহার ঃ

১। গ্রামীণ জীবনে ভূমিহীনতা বিরাট বৈশিষ্ট্য। গবেষণা আওতায় অন্তর্ভুক্ত গ্রামগুলোতে গড়ে ৫৮% পরিবার ভূমিহীন এবং শতকরা ৮৭ ভাগ পরিবার ১ একরের নীচে জমির মালিক ও মোট জমির শতকরা ২৬ ভাগের অধিকারী। তিন একরের উপরে / পরিবার ৩৭% জমির মালিক। ৫ একরের উপরে ১.৩০% পরিবার ২২% জমির মালিক। এর অর্থ এই যে, ভূমি মালিকানা কাঠামোতে অসমতা ও কেন্দ্রীকরণ সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান। অভাব অনটনে ক্ষুদে কৃষকরা জমি বিক্রী করতে বাধ্য হচ্ছে এবং যাদের কৃষির সাথে কোন যোগাযোগ নেই তারাই ক্রয় করছেন। এতে একই সাথে অনুপস্থিত ভূস্বামীর সংখ্যা এবং ভূমিহীনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২। ভূমিহীন পরিবারের অর্ধেকেরও বেশী নিয়োজিত সদস্য অকৃষি কাজে নিয়োজিত। ১৭% দিনমজুর, ২০% মাছধরাও শুধু শতকরা ১৩ ভাগ ভূমিহীন লোক পত্তনে অথবা বর্গায় কৃষি কাজ করছে। শ্রম মজুরী, গ্রামীণ শিল্প, মাছধরা, ক্ষুদে ব্যবসা, পরিবহন কর্ম ইত্যাদি পেশার অধিকাংশ লোকেই ভূমিহীন অথবা স্বল্প জমির মালিক এবং নিম্ন আয় গ্রুপের লোক। ভূমিহীনদের প্রধান পেশা ক্ষুদে ব্যবসা। তাদের জমিও নেই, পুঁজিও নেই, উপার্জনের জন্য বাকী শুধু নিজস্ব শ্রম শক্তি (গতরখাটা), যার বিক্রীর সুযোগ সীমিত ও অনিশ্চিত। ফলে তারা সর্ব নিম্ন আয় গ্রুপ এবং দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থান করে।

৩। গ্রামীণ পরিবারগুলোর জমির আয়তন বাড়ার সাথে সাথে কৃষিতে নিয়োগ বেড়ে যায় এবং নির্দিষ্ট আকার পর্যন্ত পৌঁছার পর আবার অকৃষি খাতে নিয়োগের প্রবণতা বৃদ্ধি ক্ষুদে কৃষকদের পারিবারিক শ্রম উদ্বৃত্ত কাজে লাগানোর জন্য জমি যত বেশী থাকবে ততই বেশী তারা কৃষি কাজে নিয়োজিত থাকবে। জমি মালিকানার আয়তন নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করলে চাষাবাদে মজুরী শ্রমের প্রয়োজন হয়। মজুরের পারিশ্রমিক দেয়ার পর সব সময় লাভবান হওয়া যায় না, তাই বড় জমির মালিকেরা পত্তনে জমি দিয়ে, পত্তনের টাকা ব্যবসায় বিনিয়োগ করে বেশ মুনাফা লাভের সুযোগ পায়। জমির আয়তন বাড়ার সাথে সাথে অধিক মুনাফা লাভের মাছের আড়তদারী এবং মুলী বাঁশের ব্যবসার ভাগ বেড়ে যায় এবং ক্ষুদে ব্যবসার ভাগ কমে যায়।

৪। কৃষির পরে ব্যবসাই প্রধান উপজীবিকা। ক্ষুদে ব্যবসাই বেশী এবং বেশীর ভাগ এরা ভূমিহীন অথবা স্বল্প জমির মালিক। অধিক লাভজনক ব্যবসা যেমন, মুলীবাঁশের ব্যবসা এবং মাছের আড়তদারী> বিত্তশালীদের হাতে। তারা শুধু বৃহৎ পুঁজির মালিক নয়, অর্থনৈতিক বহির্ভূত ব্যবসায়ী নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ও তাদের রয়েছে। বৃহত্তর জনগোষ্ঠি যাদের পুঁজি নেই, অথচ নিজের শ্রম ক্ষমতা এবং প্রচুর পারিবারিক শ্রম উদ্বৃত্ত রয়েছে, তারা কৃষিতে বা দিনমজুরী ও ক্ষুদে ব্যবসায় রয়েছে। আর যাদের পুঁজি আছে তারা ব্যবসা থেকে লব্ধ মুনাফায় উত্তরোত্তর ধনবান হচ্ছে এবং গ্রামীন সম্পদ এবং ক্ষমতা কাঠামোতে অধিকতর নিয়ন্ত্রণ সুবিধেভোগ করছে।

কৃষি, গ্রামীণ শিল্প, মাছধরা, দিনমজুরী - এ সমস্ত পেশা নিম্ন আয়ভুক্ত লোকদের, আর মুলী-বাঁশের ব্যবসা, মাছের আড়তদারী - এ গুলো উচ্চ আয় গ্রুপের প্রধান পেশা। এ সব ব্যবসায়ে বেশী পুঁজির প্রয়োজন, যা উচ্চ আয়ভুক্তলোকদেরই থাকানো সম্ভব। কৃষি এবং অকৃষি খাতে কর্মসংস্থানের বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বৃহত্তর শ্রমজীবি মানুষ যাদের সম্পদের তুলনায় প্রচুর উদ্বৃত্ত শ্রম রয়েছে, তারা উৎপাদনের উপকরণ, জমি ও অন্যান্য সম্পদ থেকে বঞ্চিত থেকে অর্থবেকারত্ব ও দারিদ্রের মধ্যে দিন যাপন করছে। ফলে সম্পদের সুষম বন্টনের উপর শ্রম সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নির্ভর করছে।

গ্রামের অধিকাংশ লোক বেকারত্ব ও অর্ধবেকারত্বের শিকার। কৃষকরা ফসলের মৌসুম এবং জেলেরা মাছ ধরার মৌসুম ছাড়া অর্ধবেকারত্ব জনিত আর্থিক কষ্টে দিন যাপন করে। মহিলাদের অবস্থা সবচেয়ে নাজুক। সামাজিক প্রতিবন্ধকতার মুখে উপার্জনকারী কোন কাজে অংশ গ্রহণের সুযোগ তারা পায় না, যদিও আর্থিক চাপে কেউ কেউ ঝির কাজ অথবা ধানের কলে সিদ্ধ ও শুকানোর কাজে হাড়ভাংগা খাটনি খেটে পরুষ শ্রমিকের অর্ধেক পারিশ্রমিক পায়।

৫। কৃষি ও শিল্পের মত উৎপাদন খাতের উন্নয়ন জড়িত রয়েছে জমি ও অন্যান্য গ্রামীণ সম্পদ মালিকানা কাঠামোর পুর্নবিন্যাস, সময়মত প্রয়োজন অনুযায়ী উপকরণ সরবরাহ, কৃষিজ ও শিল্পজাত দ্রব্যের বাজারজাতকরণ এবং ঋণ সরবরাহের সুব্যবস্থা।

ভূমি মালিকানার মত অভূমি সম্পদ মালিকানা গঠনেও অসম। এছাড়া জমির পরিমানের সাথে অভূমি সম্পত্তির পরিমাণের একটা সম্পর্ক রয়েছে। যারা এলাকার বড় ব্যবসায়ী পুঁজিপতি, তারা প্রাথমিক পুঁজি কৃষি জমি থেকে সঞ্চয় করে এবং পরে পুঁজি বিনিয়োগের উপর যে লাভ হয়, সেটা ব্যবসা, ধানের কল, গৃহ নির্মাণে, ঠিকাদারিতে এবং জমি ক্রয়ে বিনিয়োগ করে অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধির প্রয়াস পায়। অতএব, প্রাথমিক পুঁজি গঠন জমি মালিকানার সাথে জড়িত।

৭। বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত থেকে অনেকেই পারিবারিক আয় বৃদ্ধি করছে। জেলে, কৃষক এবং ক্ষুদে ব্যবসায় নিয়োজিত লোকজন অন্য পেশায় নিয়োজিত হয় কম। বিত্তহীনরা প্রধান পেশায় অন্ন সংস্থান না করতে পেরে উপপেশার দিকে ঝুঁকে এবং বাড়তি পরিশ্রম করে কোন রকমভাবে বেঁচে থাকার প্রচেষ্টা চালায়। অপরদিকে বিত্তবানরা অধিকতর সম্পদ সৃষ্টির আশায় বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত থাকার সুযোগ পায়। উপপেশার ধরন নির্ভর করে মূল পেশার ধরণ, পরিবারের মূলধন এবং কর্মক্ষম সদস্য সংখ্যার উপর। বেশী পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের অধিকাংশেরই জমি, মূলধন এবং কর্মক্ষম সদস্য অপেক্ষাকৃত বেশী।

৮। মৎস্য চাষ, গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগী পালন এবং শাকসব্জি ও ফল ফলাদি উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ প্রচুর অব্যবহৃত থাকছে। খুব কমসংখ্যক পরিবারই এসব উৎপাদনমূলক কাজে নিয়োজিত। অথচ এগুলোর জন্য ব্যয় হয় কম, অথচ যথেষ্ট আয়ের সুযোগ রয়েছে। তবে যাদের জমি, পুকুর, বাসস্থানের সুব্যবস্থা এবং কৃষিকাজ রয়েছে, তাদের এসব কাজ সুবিধে বেশী এবং তারাই এগুলো করছে। উপজিলা পর্যায়ে পশুপালন বিভাগ খুবই দুর্বল ভূমিকা পালন করছে এবং গ্রামীণ জনসাধারণের সাথে এ বিভাগের সংযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন একান্ত জরুরী। ঔষধ সরবরাহ ও সময়মত চিকিৎসার অভাবে গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগীর মৃত্যুজনিত ক্ষতি অনেক কৃষক পরিবারের আর্থিক বিপর্যয় ডেকে আনে। শ্রম উদ্বৃত্ত পরিবারগুলো যাতে এ কাজে অংশ গ্রহন করতে পারে, তার জন্য যথাযথ ব্যাপক ঋণ কর্মসূচী গ্রহণ একান্ত অপরিহার্য। মৎস্য চাষ, ফল-ফলাদি ও শাক-সব্জি উৎপাদনে জ্ঞান বিতরণ, পুকুর ও ভূমি সম্পদের ব্যবহার সুযোগ, ঋণ ও উপকরণ সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার উপর শ্রমজীবি মানুষের অবদান নির্ভর করছে।

৯। গ্রামের প্রায় অর্ধেক পরিবার ঋণগ্রস্ত। ঋণের মূল উৎস অপ্রাতিষ্ঠানিক, এদের মধ্যে মহাজনী ঋণে সুদের হার কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক উৎসের ১০/১৫ গুণ বেশী। স্বচ্ছল কৃষক, ব্যবসায়ী এবং চাকুরিজীবীরা ব্যাংক ও সমবায় ঋণের সুবিধা ভোগ করে। জেলেরা মহাজনের নিকট দাদনে বাঁধা থাকে এবং মাছ বিক্রীর স্বাধীনতা হারানোর সাথে আয়ের বিরাট অংশ সুদ ও কমিশন বাবদ মাছের আড়তদারের নিকট তুলে দেয়। ঋণের বৃহদাংশ ব্যবসায়ে, পারিবারিক প্রয়োজনে, খাদ্য ক্রয়ে, জমি পত্তন নিতে এবং জমি ক্রয়ে ব্যবহৃত হয়। উচ্চ আয় গ্রুপের লোকেরা ব্যবসা, জমিক্রয় ও মহাজনী পরিবারের ঋণ ব্যবহার করে, আর গরীবরা খাদ্য ক্রয়, জমিপত্তনে, চিকিৎসা ও বিবাহের মত সামাজিক অনুষ্ঠানের খরচ বাবদ ব্যবহার করে।

ক্ষুদে মালিক কৃষক ও ভূমিহীনরা বর্তমান ঋণ পদ্ধতিতে ঋণ সুবিধা থেকে মোটামুটি বঞ্চিত এবং ঋণের জন্য গ্রাম্য মহাজন ও ব্যবসায়ীর নিকট নির্ভরশীল হতে হয়। তবে যদি প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ পাওয়ার কর্মসূচীও নেয়া হয়, তা স্থানীয় বিত্তবান ও ক্ষমতাসীনদের গ্যারান্টি এবং সুপারিশ সাপেক্ষে তারা পেয়ে থাকে। ফলে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও বৃহত্তর শ্রমজীবি জনগোষ্ঠী বিত্তবানদের অত্যাচার, উৎপীড়নের সম্মুখে নীরব দর্শক ও সহনশীল ভূমিকা পালন করা শ্রেয় মনে করে এবং এতে অর্থনৈতিক ও অর্থনীতি বহির্ভূত শোষন প্রক্রিয়া আরো মজবুত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে।

১০। অধ্যায়িত গ্রামগুলোতে শিক্ষার মান খুবই নীচু। একদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সুবিধা অব্যবহৃত থেকে যাচ্ছে এবং অপরদিকে শিক্ষার হার নিতান্ত কম। শিক্ষার মান নিম্ন হওয়ার কারণ এয়ে অধিকাংশ পরিবারের আর্থিক অবস্থা এমন যে; অল্প বয়সী ছেলেদের দিয়ে ক্ষুদে ব্যবসা ও কিছু কাজকর্ম করিয়ে পারিবারিক আয় বৃদ্ধি প্রয়োজন। মেয়েদের তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে নিষ্কৃতি পেতে চায় সবাই। এলাকায় শিক্ষিত বেকারের আধিক্যও শিক্ষায় এদের নিরুৎসাহিত করে। তবে শিক্ষা-মানের সাথে আয় এবং সম্পদ মালিকানার একটা সম্পর্ক রয়েছে। নিরক্ষর পরিবারগুলো অধিকাংশই নিম্ন আয়ভুক্ত। কৃষি ও দিনমজুরী পেশার এবং অধিকাংশই ভূমিহীন অথবা স্বল্প জমির মালিক। নিরক্ষর পরিবারগুলোর লেখাপড়ার ঐতিহ্যের অভাবের জের টেনে এনে পারিবারিক ঐতিহ্যকে নিরক্ষরতার মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করার প্রবণতা জাগতে পারে। কিন্তু পারিবারিক ঐতিহ্যও যে বংশানুক্রমে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার ফসল। অতএব আর্থিক দুর্দশা লাঘব না করতে পারলে এবং শিক্ষার সাথে জীবনের সম্পর্কবোধ না জাগতে পারলে নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও সার্বজনীন শিক্ষার লক্ষ্য অর্জন কষ্ট সাধ্য হবে।

১১। গ্রামের চার পঞ্চমাংশ লোক নিম্ন আয় গ্রুপের এবং কোন মতে ... া কালাতিপাত করছে। কাজের মৌসুমে (ফসল বপন, রোপন এবং তোলা ও মাছ ধরার মৌসুম) জীবন কিছুটা ভাল চলে। মৌসুম চলে যাবার পর সঞ্চয় ভেংগে অথবা ঘরের তৈজসপত্র বিক্রী করে সংসার চালানো হয়। যে সব পবিবারের কর্মক্ষম পুরুষ লোক বেশী, সে সব পরিবারের আয় ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত বেশী। এছাড়া কৃষি জমির পরিমাণ ও জমির উৎপাদন ক্ষমতার উপর আয়ের মান বহুলাংশে নির্ভর করে। পেশার লাভজনকতাও আয়ের উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। যাদের পুঁজি ও জমি দুইই আছে, তাদের অবস্থা সবচেয়ে ভাল, যারা লাভজনক ব্যবসা যেমন, মুলী বাঁশের ব্যবসা, মাছের আড়তদারী এবং বাণিজ্যিকভাবে রবিশস্যের চাষাবাদ করছে তাদের আয়ের মান সর্বোচ্চ। দরিদ্র জনগোষ্ঠী পুঁজি ও জমির অভাবে নিজের শ্রমকে ব্যবহার করে আয় বৃদ্ধি করতে পারছে না, কর্মে অংশগ্রহণের হার, পরিবারের নির্ভরশীলতার পরিমাণ, মাথাপিছু জমি ও অন্যান্য সম্পত্তি এবং পরিবারের শিক্ষামানের সাথে আয়ের একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। উচ্চ আয়ভুক্ত পরিবারগুলোর প্রধান পেশা ব্যবসা যদিও মাথাপিছু জমি ও তাদের সর্বাধিক। অতএব আয়মানের প্রধান নির্ধারক হল সম্পদ মালিকানা, শ্রম নিয়োগের হার এবং পেশার লাভজনকতা।

১২। শোবার ব্যবস্থা, বাসস্থান এবং জীবন যাত্রার পদ্ধতি খুবই নিম্নমানের। অধিকাংশ লোক মেঝেতে ঘুমায়। বাসস্থানের অবস্থা এমনই নাজুক যে, গাদাগাদি করে অনেক লোকজনের এক ঘরে থাকতে হয়। বেশীর ভাগ ঘরই কাঁচা। অনেক পরিবারেই আলাদা কোন রান্না ঘর নেই অথবা রান্না ঘরের ছাদ নেই। অনেক সময় শোবার ঘরের একটা অংশে গুরু, ছাগল, হাঁস-মুরগী ও রাখা হয়।

১৩। একটা নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় স্থানীয় পুষ্টিগেয় কিছু সংখ্যক লোকের হাতে পরিত্যক্ত সম্পত্তিগুলো চলে গেছে এবং নদীর ভাংগনে ও বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কারণে সৃষ্ট ভূমিহীন, বিত্তহীন ও স্বল্প বিত্তের দল এ পুষ্টিগেয় লোকদের স্বেচ্ছাচারী নিয়ন্ত্রণাধীন জীবন যাপনে বাধ্য হয়েছে। রাজনৈতিক ও গ্রাম্য দলাদলিতে বিত্তবানদের কেন্দ্র করে সমাজ ও গোষ্ঠিবোধ ক্রিয়া করে। স্থানীয় নেতৃত্বে, সমবায় সমিতি সংগঠনে, সরকারী উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে, ঋণপ্রাপ্তিতে, সরকার প্রদত্ত উপকরণ বন্টনে তারাই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন সমবায়ের ম্যানেজার, বি আর, বি'র সভাপতি ও ডাইরেক্টার, উপজিলা চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্য সবাই উচ্চ আয়ধারের এবং তাদের উপর নির্ভর করছে কিভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডগুলো চলবে।

পুষ্টিগেয় এ ধনীলোকদের হাতেই জনগণের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ব্যবহারের সুযোগ এমন অবস্থা সৃষ্টি করেছে যে উপজিলা পর্যায়ের অফিসাররা পর্যন্ত তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। নিয়ন্ত্রনের বাইরে কোন কাজ করতে পারেন না। সরকারী অফিসাররা এ বিত্তশালীদের স্বার্থের সংগতিপূর্ণ কাজ করে চাকুরে জীবন অতিবাহিত করছেন। জনস্বার্থের বিরুদ্ধে হলে তাদের কিছু বলার থাকে না যদি নিশ্চিন্তে চাকুরী করতে চান।

স্থানীয় ক্ষমতাবানরা পত্তনে জমি বর্গা দেয়, মজুর খাটা দিয়ে চাষাবাসের কাজ করায় এবং লাভজনক ব্যবসা, ঠিকাদারীও আধুনিক ক্ষুদ্র শিল্পের নিয়ন্ত্রণ করে। এরা বিভিন্ন সংগঠনের ভিতরে অথবা বাইরে থেকে প্রভাব বলয় সৃষ্টি করতঃ নিজদের স্বার্থের অনুকূলে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধে আদায় করে নেয়। গ্রাম্য শালিসের ভারও তাদের উপর। তাদের লেকেরা অত্যাচার করে, আদায় বিচারের ভারও তাদের উপর পড়ে। অতএব সমগ্র জনগোষ্ঠী তাদের নিকট আষ্টে পৃষ্ঠে বাধা থাকে।

উপজিলা পর্যায়ের অফিসাররা স্পষ্ট দেখতে পায়, এলাকায় উন্নয়নমূলক কিছু করতে হলে এ পুষ্টিগেয় ধনবান ও স্থানীয় ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের সহযোগিতা ছাড়া কিছু করা সম্ভব নয়। যদিও তা জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে। এভাবে উন্নয়ন কর্মকান্ড চলে জনগণের ইচ্ছা আকাংখা ও অংশগ্রহণের প্রতি দৃষ্টি না রেখে। অথচ প্রশিক্ষণকালে তাদের আপামর জনগণের সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের উপর জোর দিয়েই কাজ করার কথা বলা হয়েছিল। স্থানীয় বাস্তব ক্ষমতা চক্রের সাথে পড়ে তারা নতুনভাবে শিক্ষা পায় এবং আপামর জনসাধারণের মতই নিষ্ক্রিয়ভাবে স্থানীয় বিত্তবানদের ক্ষমতাচক্রের সাথে আবর্তিত হতে থাকে।

টীকা ও গ্রন্থপঞ্জী

১) গ্রামীণ অর্থনীতি উন্নতির কোন লক্ষণ নয়, বরঞ্চ যুগযুগ ধরে আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক শোষণ প্রক্রিয়ার ফসল ও প্রযুক্তিগত পশ্চাৎপদতার নির্দেশক। উন্নয়নের সাথে সাথে গ্রামীণ অর্থনীতির যে রূপান্তর ঘটে তা বিভিন্ন দেশের উন্নয়ন দ্বারা পর্যবেক্ষণ করলে বোধগম্য হবে। উন্নত বিশ্বে মাত্র ৩৫% লোক গ্রামীণ জীবনের অধিবাসী, অন্যদিকে অনুন্নত বিশ্বে শতকরা ৭৫ ভাগের অধিক গ্রামের অধিবাসী।

২) স্বপন আদনান,

"Working papers of village study group", 1978.
"Land,power & violence in Barisal villages" political economy 2(1), 1976.

"Preliminary finding of a socio-economic study of four Bangladesh villages", Dhaka University Studies Part A, Vol.23, June 1975.

সৈয়দ আবদুল কাদির(১৯৬৪)

Village Dhaniswar - Three generations of man land adjustment in an East Pakistan village; Comilla, BARD.

রামকৃষ্ণ মুখার্জী,
"Six villages of Bengal", Bombay popular prokashani, 1971.

পিটার, জে, বারটোসি,

"Elusive villages: Social Structure and Community Organisation in rural East Pakistan, Michigan, Michigan State University, 1970.

ওয়েস্টারগার্ড, কির্স্টেন

"Boringam - An economic analysis of a village in Bangladesh" Bogra Rural Academy, 1980.

আসাদুজ্জামান, এম,
Kaliganj village: an economic survey, Dhaka, BIDS, 1973.

জাহাংগীর, বি,কে,
"Differentiation, polarisation and confrontation in rural Bangladesh", Dhaka, Centre for Social Studies, 1979.

জন, পি, থর্প
"Power among the farmers of Daripalla - a Bangladesh village study", Dhaka Caritas, 1978.

ইয়েনেকো আরেন্স ও ই ও সফান বুরেদেন,
ঝগড়াপুর - গ্রামবাংলার গৃহস্থ ও নারী - (১৯৮০) আমস্টারডাম, নেদারল্যান্ডস।

উড, জি, ডি, ১৯৭৬

The Politics of rural development in Bangladesh: A study of class and power from a Comilla village: Comilla(1975), BARD.

৩) জরীপ কাজটি প্রয়োগিক গবেষণার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়েছিল। এ গ্রামগুলির আর্থ-সামাজিক কাঠামো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা অপ্রকাশিত ওয়ার্কিং পেপারে করা হয়েছে।

৪) দেখুন, Labour Force Survey, 1983 - 84

৫) বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকায় ৩৮% লোক অকৃষি কাজে নিয়োজিত, দেখুন, Lobour Force Survey, 1983-84.

৬) নাথ, নারায়ন চন্দ্র ও অন্যান্যরা এর পূর্বে হারিয়া গ্রামের উপর জরীপ কাজ পরিচালনা করেন। জরীপের ফলাফল " Socio-economic Study of Village Haria"(1980) তে সন্নিবেশিত হয়েছে।

৭) এস, আর, ওসমানী এবং আতিকুর রহমান

"A Study on income distribution in Bangladesh, 1979, BIDS.

৮), Rural industries study project, BIDS, 1980.

৯) দেখুন, Bangladesh Census of Agriculture and Livestock, 1983, 84 BBS, 1986.

১০) দেখুন, Report on the Survey of pond, 1982, BBS.

১১) অভূমি সম্পদ মালিকানার উচ্চ গ্রুপের অনেকে জমি ও কৃষি কাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থেকে বাণিজ্যে নিয়োজিত। ফলে তাদের অনেককেই ভূমিহীনের পর্যায়ে ফেলা স্বাভাবিক। অথচ ভূমিহীন নয় সবাই। ব্যবসায়ীদের অনেকেই কর্ষনযোগ্য জমি রাখেনি এবং চাষাবাদে তাদের আগ্রহও নেই - এ অর্থে ভূমিহীন। অতএব সব ভূমিহীন এক নয়। এ এলাকায় অনেকেই নদীর ভাংগনে জমি হারিয়ে যাওয়ার ফলে ও এ ধরনের ভূমিহীন অভূমি সম্পদে সম্পদশীল হিসাবে অবতীর্ণ হয়েছে।

১২) ১৯৪৭ সনের সংজ্ঞা অনুসারে লিখিত ও পড়তে পারা এবং পড়ে বুঝাকে স্বাক্ষরতার মান ধরলে নিরক্ষরতার হার অনেক বৃদ্ধি পাবে। এখানে নিরক্ষর বলতে অক্ষরজ্ঞান নেই যাদের - তাদের ধরা হয়েছে।

১৩) দেখুন, Socio-economic Indicators of Bangladesh, 1986

১৪) আয়মানের সাথে মাথাপিছু জমি, শিক্ষা, মাথাপিছু অভূমি সম্পদ, উপার্জনক্ষম পরিবার সদস্যদের অংশগ্রহণের হার এবং পেশার লাভজনকতা পৃথকভাবে সরাসরি সম্পর্ক নাও পাওয়া যেতে পারে। এগুলো সম্মিলিতভাবে আয়মান নির্ধারণে ক্রিয়াশীল।

১৫) লেখচিত্র - ১ এ আয়ের সাথে ৬টি সহ সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। ১ নং রেখায় মাথাপিছু অভূমি সম্পদের সাথে আয়মানের সহসম্পর্ক দেখানো হয়েছে।

২ নং রেখায় পরিবারের শিক্ষার স্কোরের সাথে আয়মানের সহসম্পর্ক দেখানো হয়েছে।
৩ নং রেখায় মাথাপিছু কর্ষিত জমির সাথে আয়মান সম্পর্ক নির্দেশিত হয়েছে।
৪ নং রেখায় পরিবারে উপার্জনকারী সদস্য সংখ্যার সাথে আয়ের সম্পর্ক ব্যক্ত হয়েছে।
৫ নং রেখায় পরিবারের উপার্জনকারী শ্রম হারের সাথে আয়ের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে।
৬ নং রেখায় মাথাপিছু মালিকানাধীন কর্ষনযোগ্য জমির সাথে আয়মানের সম্পর্ক ব্যক্ত হয়েছে।

১৬) জাতীয় পর্যায়ে ৬২% বাসগৃহ ছন অথবা খড়ের ছাদের এবং মাত্র ৩৪.৫% টিনের ছাদের তৈরী। এ দিক থেকে গ্রামগুলোর অবস্থা ভাল মনে হলেও ছোট ছোট ঘরে যেভাবে গাদা - গাদি করে লোক বাস করে, তাতে বাসস্থান সংকট প্রকট মনে হয়।

১৭) গুনার মির্ডাল,

"Asian Drama - an enquiry into the poverty of nations" abridged in one volumme by Seth S. King (1968).

BIDS Library
E-17, Agargaon, Dhaka
Acc.# 86938
Date: 22-10-1987
MFN #

B. I. D. S. LIBRARY
DHAKA
Acc. No. 292
Date 22/10/79